দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় দুর্নীতির ঘুণপোকা— পৃঃ ১৩

৭৫ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।। ৭ ফাল্গুন - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

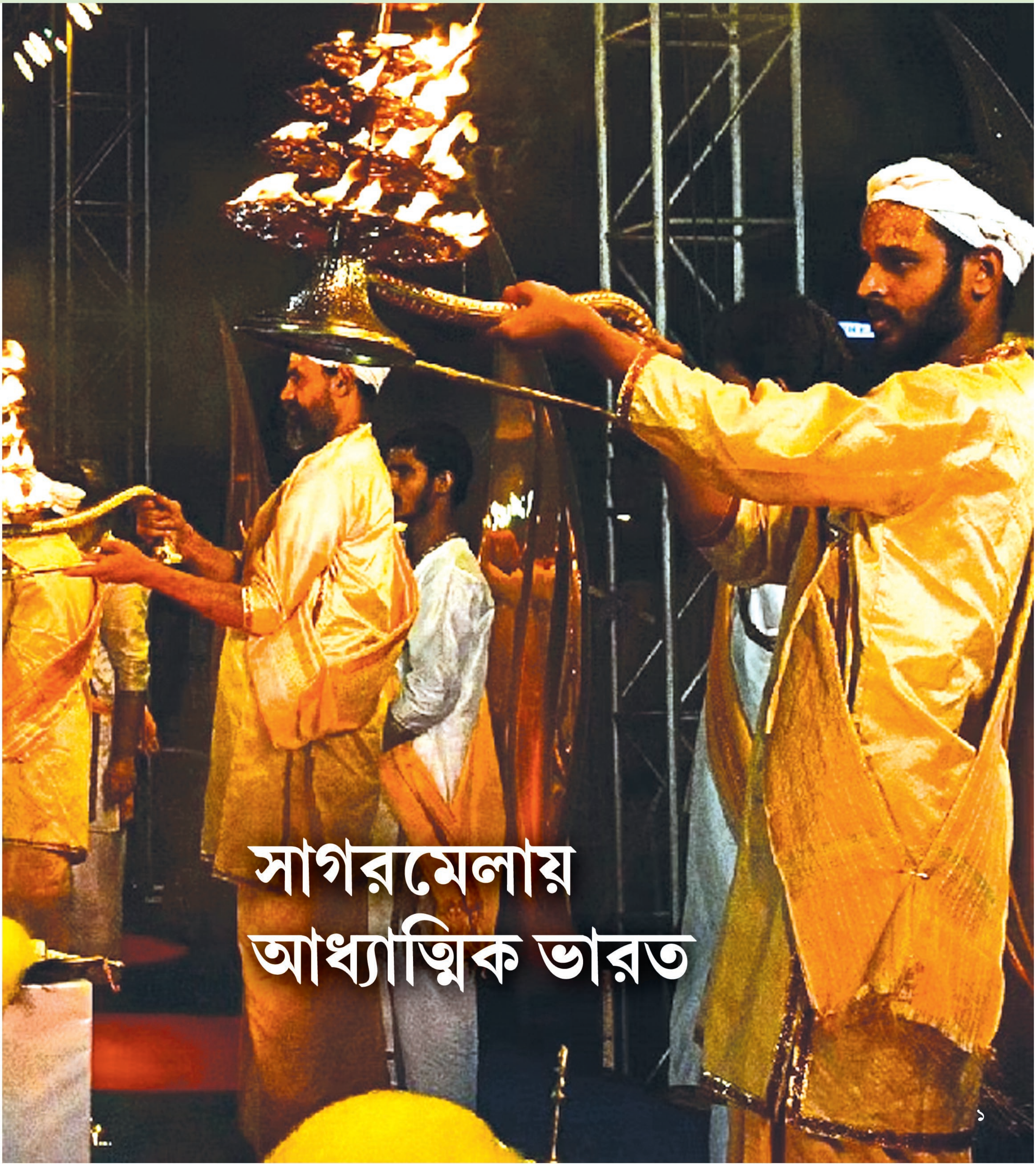

সাগরমেলায় আধ্যাত্মিক ভারত

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ৭ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২০ ফেব্রুয়ারি - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

গরিবের গরিব থাকার অধিকার চাই ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

আদানি সংক্রান্ত তোলপাড়ের মধ্যে কোনো অর্থনৈতিক সর্বনাশের ইঙ্গিত পাওয়া গেল না ◻ আর. জগন্নাথন ◻ ৮

যুদ্ধ থামিয়ে দিক ভারত, আর্জি সারা বিশ্বের

◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

এবার হিন্দুদের নিজের একটা দেশ হোক

◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১১

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় দুর্নীতির ঘুণপোকা

◻ দীপ্তাস্য যশ ◻ ১৩

তৃণমূল জমানায় বারুদের স্তূপে পশ্চিমবঙ্গ

◻ সঞ্জীব দে ◻ ১৭

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ◻ হীরক কর ◻ ২৩

চারিদিকে মাননীয়ার মুখ, বিরক্ত পুণ্যার্থীরা

◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ২৯

কুকথার বান রুখতে সহবতের পাঠ দিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

◻ ড. জয়ন্ত কুশারী ◻ ৩১

'হিন্দু' নামের উৎস সন্ধানে ◻ সৌমেন নিয়োগী ◻ ৩৩

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য রাহুল গান্ধীর মনোবেদনা

◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৩৮

বাঙ্গালি না বুঝলে বাংলা ধ্রুপদীভাষা হবে না

◻ দেবলীনা চৌধুরী ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৩৫-৩৭ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ স্মরণে : ৪৬ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

ফঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৭ ফেব্রুয়ারি
২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৭ ফেব্রুয়ারি
২০২৩

অপারেশন দোস্ত

তুরস্ককে ভারতের বন্ধু দেশ কখনোই বলা যাবে না। নূপুর শর্মা কাণ্ডে তুরস্ক বিশ্বজুড়ে ইসলামিক লবিকে ভারতের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এছাড়া রাশিয়ার কাছ থেকে ক্রুড অয়েল কেনার কারণে ভারতকে ব্যান করার জন্য আমেরিকার কান ভারী করার চেষ্টা কম করেনি। অথচ তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর ভারত সবকিছু ভুলে নির্দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্ভবত এটাই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে ভারতের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। লিখবেন— ড. রাজলক্ষ্মী বসু, নিখিল চিত্রকর প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজনীতিতে পঙ্কিল মেলার মুখ

বলা হইয়া থাকে যে, সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার। ইহার ভাবার্থ হইল, এই তীর্থস্থান এতই দুর্গম স্থানে অবস্থিত ছিল যে বারবার তথায় তীর্থ করিতে যাওয়া সম্ভব ছিল না। নদীনালা, বনজঙ্গল, চোর, দস্যু ও জন্তুজানোয়ারে পরিপূর্ণ ছিল সেই অঞ্চল। তবু মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে সাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া একটুখানি পুণ্য লাভের আশায় যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ এই তীর্থে ছুটিয়া আসিয়াছেন। এই তীর্থস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশম্-এও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাণ হাতে লইয়া এই দুর্গম তীর্থস্থানে আসিবার উল্লেখ রহিয়াছে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে।

স্বাধীনতা লাভ করিবার পরও গঙ্গাসাগর তীর্থের দুর্গমতা নিরসনকল্পে এই রাজ্যের শাসকবর্গের কোনোরূপ আগ্রহ ছিল না। ১৯৫৩ সালে লোক দেখাইবার জন্য গঙ্গাসাগর মেলা আইন করা হয়। ১৯৭৫ সালে শুধুমাত্র একটি যাত্রীনিবাস নির্মাণ করা হয়। ইসলামি আমলের মতো ব্রিটিশ আমলেও পুণ্যার্থীদের তীর্থকর দিতে হইয়াছে। ব্রিটিশ আমলে তাহা ছিল এক পয়সা। পরবর্তীতে তাহা একটাকা করা হয়। তখনকার দিনে তাহাই ছিল পুণ্যার্থীদের নিকট সাধ্যাতীত। নৌকাডুবি-সহ কত বিপদ ঘটিয়াছে, বসন্ত, ওলাওঠায় কত প্রাণ গিয়াছে, তবু পুণ্যার্থীদের আসার বিরাম ছিল না। ধর্মবিরোধী তথা হিন্দু বিরোধী বাম সরকার মাথাপিছু পাঁচটাকা তীর্থকর ধার্য করিয়াছিল। কিন্তু মেলার উন্নতিকল্পে তাহারা কিছুই করে নাই। বর্তমান রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ যে তাহারা গঙ্গাসাগরের তীর্থকর উঠাইয়া দিয়াছে। সেইসঙ্গে অপ্রতুল হইলেও তীর্থযাত্রীদের জন্য যাতায়াত, আবাস, শৌচাগার, বিদ্যুৎ, পানীয়জল ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিষেবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে ইহা বলিতেই হইবে যে, সমগ্র দেশ হইতে আগত তীর্থযাত্রীদের নিকট এই সবকিছু ছাপাইয়া শাসকদলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটিই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। মেলা পরিসর যেন মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে মুখ ঢাকিয়াছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চগুলিতে শাসকদলের রাজনৈতিক প্রচার প্রাধান্য পাইয়াছে। শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের ঘন ঘন আনাগোনায় মেলার ধর্মীয় পরিবেশ বিঘ্নিত হইয়াছে। সংবাদমাধ্যমের সামনে তাহারা শুধুই নিজেদের প্রচার করিয়াছে, আর প্রতিটি কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছে। অথচ ২০১৯ সালে সারা দেশের মানুষ দেখিয়াছে প্রয়াগরাজে অর্ধকুম্ভমেলার ব্যবস্থা। ৪৯ দিবসীয় এই মেলায় ২৪ কোটিরও বেশি পুণ্যার্থীর সমাগম হইয়াছিল। ইহার মধ্যে দশ লক্ষেরও বেশি বিদেশি পুণ্যার্থী। এই মেলাকে উপলক্ষ্য করিয়া যোগী সরকারের লক্ষ্য ছিল তাহার রাজ্যকে শুধু দেশেই নহে, সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে কীভাবে তুলিয়া ধরা যাইবে। যোগী সরকারের সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সমগ্র দেশ তথা বিশ্ব দেখিয়াছে যোগী সরকারের আন্তরিকতা। মেলাকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক কথাবার্তা কেহ লক্ষ্য করেন নাই। মেলায় পাঁচশতেরও অধিক বিভিন্ন বিষয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু কোথাও রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মঞ্চ আলো করিয়া বসিতে দেখা যায় নাই। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থাকে ওই অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। মেলার ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যোগী সরকারের ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী পুণ্যস্নান সমাপন করিয়া মেলাকে যাহারা স্বচ্ছ রাখিবার দায়িত্ব লইয়াছেন সেই সাফাইকর্মীদের চরণধৌত করিয়া তাহাদের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়াছেন। বিশ্বের ৭২টি দেশের কূটনীতিক মেলায় উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বস্তরের মেলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর মেলাকে সামনে রাখিয়া সমগ্র ভারতে এই রাজ্যের ভাবমূর্তি উচ্চে তুলিয়া ধরিতে পারিতেন। কিন্তু বাঙ্গালির দুর্ভাগ্য যে এই রাজ্যের শাসকরা তাহাদের দল, ভোটব্যাংক এবং সর্বোপরি নিজেকে ব্যতীত আর কিছুই ভাবিতে পারেন না। বাম আমল হইতে অদ্যাবধি পশ্চিমবঙ্গের যে সর্বদিক হইতে অবনমন ঘটিয়াছে, গঙ্গাসাগর মেলাকে সামনে রাখিয়া বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সেই লজ্জার কিছুটা হইলেও উপশম ঘটাইতে পারিতেন।

সুভাষিতম্

ক্ষমা বলমশক্তানাম্ শক্তানাম্ ভূষনম্ ক্ষমা।

ক্ষমা বশীকৃতে লোকে ক্ষময়া কিম্ ন সিদ্ধতি।।

ক্ষমা নির্বলদের বল, ক্ষমা বলবানদের ভূষণ, ক্ষমা বিশ্বকে বশীভূত করে। অতএব ক্ষমা দ্বারা কোন কাজ সিদ্ধ হয় না?

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সামনেই ত্রিপুরার ভোট। তাতে তৃণমূলের 'নাও' পুনরায় ডুববে বলেই আমার ধারণা। সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিয়রে সংক্রান্তি। মমতার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্নিপরীক্ষা। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দল আর পরিবারের মুখ রক্ষার দায়িত্ব অভিষেকের হাতে। গোদের ওপর বিষফোঁড়া দলীয় বিরোধীরা। রাহুল গান্ধীর এক হাল। নয় রাজ্যে নির্বাচন। অথচ কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতা তাঁকে গুরুত্ব দেন না। সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। জনপ্রিয়তার নিরিখে বিজেপি বা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাহুল বা তাঁর দলের থেকে নক্ষত্র সমান দূরে এগিয়ে রয়েছেন। এটাই দুই কংগ্রেস-- তৃণমূল আর জাতীয় কংগ্রেসের ধারা। পেছন থেকে বন্ধুকে আঘাত কর যাতে সে শত্রু চিনতে পারে। ৭৫ বছর আগে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে মাপজোকের স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে ভারতবাসী তাই দেখে আসছে।

ইদানীং রাহুল গান্ধী আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে দাপাদাপি শুরু হয়েছে। নায়েব সাংবাদিকরা ভোল পালটে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। রাহুলের ভারত জোড়ো আর অভিষেকের তৃণমূল শোধন যাত্রাকে বন্ধ্যা বলেই মনে হয়েছে। আমার মতে ভারত জোড়ো আসলে মোদী তোড়ো। অভিষেকের সব আবেদনকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে নীচুতলার কর্মীরা। অভিষেক দুবার আর রাহুল চারবারের সাংসদ। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাবে কোনো শিল্পপতির ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করা যায় না সেটা বোঝার বুদ্ধি রাহুলের নেই। এধরনের বালখিল্য ব্যক্তির হাতে দেশের রশি? নৈব নৈব চ। অভিষেক দুর্নীতিহীন নতুন তৃণমূল তৈরির ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছেন। এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখালে যা হয় তাই হতে চলেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর সনিয়া গান্ধী এখন চালচিত্র। মমতা পান সাজাচ্ছেন, খাবার ভাজছেন আর সনিয়া কন্যার সংসার সামলাচ্ছেন। মমতা আর সনিয়া জানেন, বন্যেরা বনে সুন্দর আর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। তাই অভিষেক আর রাহুলকে পক্ষীমাতার মতো আগলে রাখেন। তাতে দুজনের রাজনৈতিক প্রগতি যে অসম্ভব তা হলফ করে বলা যায়। তৃণমূল অপদার্থ আর দুর্নীতিবাজদের দল নয় ত্রিপুরা ভোটে অভিষেককে তা প্রমাণ করতে হবে, নচেৎ দলের মধ্যে তার কেষ্টবিষ্টুদের কোপে পড়বেন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা দুর্নীতির বহর দেখে মমতা ঘাবড়ে গিয়েছেন। তাই নিজেকে গুটিয়ে রাখছেন। অভিষেককে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন। হাস্যকরভাবে অভিষেক পুরনো তৃণমূলকে দুর্নীতিমুক্ত করে নতুন তৃণমূল খাড়া করবেন বলে মমতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অথচ নিজের বিরুদ্ধেই দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ উঠছে। এখন তিনি দলীয় বিরোধীদের নিকেশ করতে ব্যস্ত।

> **"চার বছরের রাজনৈতিক টানাপোড়েনে মমতা তার দুই আস্থাভাজন মুকুল রায় আর শুভেন্দু অধিকারীকে হারিয়েছেন। অভিষেককে সামনে এনে সে ক্ষতি পূরণ হবে না।"**

সম্প্রতি একটি নির্মাণ সংস্থায় বেআইনি টাকা লেন-দেনে এক মন্ত্রী আর তার ভাইয়ের নাম উঠে এসেছে। কিছু নিরীহ বিধায়ক তাতে আটকে যেতে পারেন। এই ঘটনায় অভিযুক্ত একজন ঘরেলু ব্যক্তিও। এরাই নাকি অভিষেক বিরোধী। দোষীরা শাস্তি পেলে দলের ভেতরে অভিষেকের জমি শক্ত হবে। তবে তাতে তৃণমূল বা তার ওপর রাজ্যের মানুষের আস্থা ফিরবে বলে মনে হয় না। একটি সমীক্ষা বলছে, এই মুহূর্তে লোকসভা ভোট হলে কংগ্রেস বড়োজোর সত্তরটি আসন পাবে আর বিজেপি তিনশোর কিছু কম।

চার বছরের রাজনৈতিক টানাপোড়েনে মমতা তার দুই আস্থাভাজন মুকুল রায় আর শুভেন্দু অধিকারীকে হারিয়েছেন। অভিষেককে সামনে এনে সে ক্ষতি পূরণ হবে না। শুভেন্দুবাবু এখন রাজ্যে মমতা বিরোধী সবচাইতে জনপ্রিয় মুখ। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, আগামীদিনে রাজ্যের মসনদে তিনিই যোগ্য ব্যক্তিত্ব। ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকায় মুকুলবাবু নির্জীব হয়ে গিয়েছেন। অভিষেকের প্রতি মমতার অন্ধ স্নেহের কারণেই তাঁরা মমতার থেকে সরে যান। যেমন কংগ্রেসে তৈরি হয়েছিল ছাব্বিশের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী। তবে মমতা আর সনিয়া এখন চোখ বুজেই রয়েছেন। এমন দুরবস্থা যে এই দুয়ের ঝাঁপি বন্ধ করেও দলের শেষ রক্ষা হবে না। □

গরিবের গরিব থাকার অধিকার চাই

গরিবদরদি দিদি,

বাজেটের কথা উঠলেই মানুষের মনে হয় কীসের দাম বাড়ল আর কমল। কী পেলাম। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার একটা নতুন নীতি নিয়েছে। ওরা দেখাচ্ছে, বাজেট মানে দেশ কী পেল, দেশের কী পাওয়া দরকার। বলছে, দেশের উন্নতি মানেই মানুষের উন্নতি। আর দেশবাসীর উন্নতি মানেই দেশের অগ্রগতি।

কিন্তু দিদি, এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমি আপনার ভাই হিসেবে আপনার দীক্ষাতেই দীক্ষিত। আমি মনে করি, বড়ো লোকের যেমন আরও বড়োলোক হওয়ার অধিকার রয়েছে, তেমনই গরিব মানুষের গরিব থাকাই উচিত। তাঁদের সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া উচিত নয়। ওরা বছরের পর বছর কাঁচা বাড়িতেই থাকবে, একশো দিনের কাজ করে তবে খেতে পাবে। নইলে নয়। একে বলে গরিবের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা।

আগামী অর্থবর্ষের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন তা দেখে কেউ বলছে না আমরা বঞ্চিত। আবার কেউ অভিযোগ তুলতে পারছে না যে অমুক শ্রেণীকে দেখে বাজেট তৈরি করা হয়েছে। সর্বস্পর্শী এই বাজেটের নামই তাই দেওয়া হয়েছে সপ্তঋষি। এটা কোনো কথার কথা হলো?

কেন্দ্রের বক্তব্য, সাধারণভাবে বাজেট একটি বছরের জন্য তৈরি করা হয়। কিন্তু একটি বছর একটি জাতির ক্ষেত্রে খুবই নগণ্য সময়। রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য সেই একই কথা প্রযোজ্য। সেই ভাবনা থেকেই বাজেটে এমনভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে যাতে বর্তমানের মঙ্গলসাধনের পাশাপাশি আগামীর ভিত মজবুত হয়। তাই এই প্রথম পরিকাঠামো-সহ মূলধনী খাতে ১০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি খরচ করতে চলেছে সরকার। আগের বছরের খরচের তুলনায় বরাদ্দ প্রায় ৩৭ শতাংশ বেশি। মানে পরিকাঠামো হলে সবাই কাজ পাবে। কারণ, কাজ দিতে হলে তো তার জন্য পরিকাঠামো প্রয়োজন।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে রাজ্যে রাজ্যে পরিকাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করেছে কেন্দ্র। যে সব রাজ্য কাজ করে তাদের কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু যারা কাজ না করে অর্থ লুঠ করতে চায় তাদের জন্য সতিই সমস্যা। এটা কোনও কাজের কথা হলো? আপনার ভাই, দাদাদের কী হবে বলুন তো! যারা জেলে রয়েছে তাদের নিয়ে ভাবছি না, কিন্তু জেলের বাইরের ভাই তো সংখ্যায় অনেক বেশি। তাদের কী হবে?

জানি ওঁরা কাজ পেয়ে গেলে আর ভোট দেবেন না। ওঁদের জন্য টাকা সরিয়ে অন্য খাতে খরচ করা যাবে না। কিন্তু এটাও তো প্রশ্ন, গরিব কি চিরকাল গরিব থেকে যাবে?

দিদি আপনার দল একটা সঠিক কথা বলেছে। বাজেটের একটা কঠিন জায়গা ধরে ফেলেছে। একশো দিনের কাজের বরাদ্দ কমানো হয়েছে অনকটা। এটা ঠিক। কিন্তু তার পিছনেও যুক্তি রয়েছে কেন্দ্রের। সমাজ কল্যাণ, নারী-শিশু কল্যাণ, গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য— কোনও খাতেই সামগ্রিক ভাবে বরাদ্দ কমাননি অর্থমন্ত্রী। বলেছেন, একশো দিনের কাজে বরাদ্দ কমানো হয়েছে নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুসারেই। কারণ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জলজীবন মিশনে বরাদ্দ অনেকটা বাড়ানো হয়েছে। সেটাও তো গ্রামেই খরচ হবে। আবার গ্রামের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ বেড়েছে। তাতে সামগ্রিক উন্নয়ন হবে। তার মাধ্যমেও কাজের সুযোগ তৈরি হবে। ফলে একশো দিনের কাজের চাহিদা কমবে। এটাই যুক্তি কেন্দ্রের। সঙ্গে এটাও জানিয়েছে যে, প্রয়োজন পড়লে আরও অর্থ বরাদ্দ হবে।

কিন্তু দিদি, আপনার ভাই হয়েও আমার মনে একটা প্রশ্ন। আপনি রাগ করবেন না ভেবেই বলছি। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও কেন দেশের একটা অংশের মানুষ সরকারি অর্থে একশো দিনের কাজের ওপর নির্ভর করে বাঁচবেন? ধীরে ধীরে সেই সব মানুষের সংখ্যা তো আমাদের কমাতেই হবে।

জানি ওঁরা কাজ পেয়ে গেলে আর ভোট দেবেন না। ওঁদের জন্য টাকা সরিয়ে অন্য খাতে খরচ করা যাবে না। কিন্তু এটাও তো প্রশ্ন, গরিব কি চিরকাল গরিব থেকে যাবে?

দিদি কি রাগ করলেন? □

অতিথি কলম

আর. জগন্নাথন

আদানি সংক্রান্ত তোলপাড়ের মধ্যে কোনো অর্থনৈতিক সর্বনাশের ইঙ্গিত পাওয়া গেল না

দেশের অগুনতি রাজনৈতিক ও মিডিয়া বিতর্কের ঘনঘটার মধ্যে বিভিন্ন আদানি কোম্পানির শেয়ারের পতন কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। সেখানে প্রচুর উত্তাপ সৃষ্টি হলেও কোনো আলো জ্বলল না। শাসক ও বিরোধী কারোরই প্রতিক্রিয়া জমাট বাঁধল না। অবশ্যই হঠাৎ করে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মূল্যে অস্বাভাবিক পতনের কারণ খোঁজার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয় ছিল। কিন্তু এই অনুসন্ধান করার দায়িত্ব দেশের শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার। কিন্তু সমালোচনার অভিমুখ সবসময়ই ছিল ভুল দিকে, এমনকী প্রাথমিক অর্থনৈতিক যুক্তির বাইরে।

পরিতাপের বিষয় যে, হিন্ডেনবার্গের আদানির কোম্পানিগুলি নিয়ে মুণ্ডপাত করা রিপোর্টগুলির বিরুদ্ধে শাসকদলের মিডিয়া বিভাগের প্রতিক্রিয়ায় আরও বিদেশি চক্রান্তের উল্লেখ করা হয়েছে। এই চক্রান্তের উদ্দেশ্য ভারতের ক্রম প্রসারমান অগ্রগতিকে কলঙ্কিত করা —এটাই তাদের অনুমান। কিন্তু বাস্তবে এই কুৎসামাখা খবরের উদ্যোক্তার পরিচয় খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খবরের বিষয়বস্তু। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য এবং ভারসাম্যময় পর্যবেক্ষণ পাওয়া গেছে অন্য একটি বিদেশি উৎস থেকেই। সেখানে একেবারে Valuation report করা হয়েছে। এই বিষয়ে মান্য পারদর্শী New york Stern School of business-এর অন্যতম বিশারদ অশ্বত্থ দামোদরণের কাছ থেকে।

ভারতের কয়েকটি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকার ও তাঁর নিজস্ব ব্লগে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন হিন্ডেনবার্গের আদানিকে একজন Conny capitatist (জাল ব্যবসায়ে যুক্ত, অন্য দীর্ঘ ব্যাখ্যাও আছে) তকমা দেওয়াটা সম্পূর্ণ মিথ্যে ও ভুল। অবশ্যই আদানির ব্যবসায়ী উদ্যোগগুলির অর্থনৈতিক মূল্য নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতেই পারে। দামোদরণ তাঁর বিশ্লেষণটির নির্যাস হিসেবে আদানির ব্যবসার ক্ষেত্রে বিদেশি ফান্ড থেকে অর্থ সংগ্রহ করার ওপর নির্ভরতাই সমস্যার জন্ম দিয়েছে বলে মনে করেছেন। যদিও তিনি এও বলেছেন অত্যধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় এমন অতিকায় সব পরিকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঋণ নেওয়া আদৌ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

দামোদরণ বলেন, একই উদ্যোগপতির নিজেরই বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগের জন্য গঠিত আলাদা আলাদা কোম্পানিতে সেই ঋণ বিতরণ করালে তাকে জালিয়াতি আখ্যা দেওয়া অন্যায়। তিনি জানিয়েছেন, আদানির অত্যধিক ঋণের মূল কারণ (হিসেব অনুযায়ী) তাঁরই নিজের পরিচালিত কোম্পানিগুলিতে প্রমোটারের অংশীদারিত্বের (তাঁর নিজের) মাত্রা অত্যন্ত অধিক শতাংশে ধরে রাখা। কিন্তু ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে এটি আদৌ অস্বাভাবিক নয় বরং সত্য, বিশেষ করে অজস্র পারিবারিক মালিকানার শিল্প উদ্যোগের ক্ষেত্রে এটি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত।

তবে আদানি ও তার বিশাল শিল্প সাম্রাজ্য নিয়ে যে চমকপ্রদ ঘটনাগুলি ঘটল তা থেকে বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আদানিকে রসাতলে পাঠানোর গোটা সমালোচনা পর্বটিই হয় অপ্রমাণিত নয়তো আদৌ প্রমাণযোগ্য নয়।

(১) আদানির সম্পদ নিয়ে মাথা কুটে মরা খুবই সমস্যাসঙ্কুল। খুবই একটা অল্প সময়ের জন্য তিনি হয়তো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সম্পদশালীদের পংক্তিতে উঠেছিলেন কিন্তু যুগপৎ তিনি একটি নাটকীয় পতনেরও সাক্ষী। কাগজে বর্ণিত সম্পত্তি কখনই প্রকৃত সম্পত্তি নয় যদি না তাকে বর্ণিত দামে সেইদিনই বাজারে বিক্রি করা যায়। এইটি শিক্ষার প্রথম বিন্দু।

(২) কোনো নির্দিষ্ট সময়কে ধরে সামগ্রিক ফলাফল ও কারণ নির্ধারণ করা যায় না। মোদীর সময়েই আদানির চূড়ান্ত সম্পদবৃদ্ধি হয়েছে এই মর্মে তাঁর দিকে অজস্র অঙ্গুলি নির্দেশিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাঁর উন্নতি অনেক আগেই শুরু হয়েছে আর মোদীর কালপর্বে যে চমকপ্রদ উর্ধ্বাভিযান হয়েছে অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধির সেই উল্লম্ফন বিশ্বের বৃহৎ macro development-এর কারণে।

(৩) বিশ্বের শেয়ার বাজারে শেয়ারের মূল্যমান ২০০৮ থেকে ২০২২-এর মধ্যে মাত্রাতিরিক্তভাবে বেড়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে সেই বৃদ্ধি ঘটেছে ২০১৪ থেকে ২০২২ পর্যন্ত তিনগুণ। আর দ্রুততম শেয়ার মূল্যবৃদ্ধির যাত্রায় আদানির বাদ পড়ার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। শেয়ারের এই দর বৃদ্ধি আরও সহজ হয়েছিল ব্যাংকগুলির প্রায় নিম্নতম হারে ঋণদান করার নীতিতে। স্বাভাবিক ভাবেই বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলি থেকে ঋণ নেওয়া বাজার থেকে equity share বিক্রি করে টাকা তোলার চেয়ে অনেক নিরাপদ ও আকর্ষণীয়। সারা বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলি থেকে কম সুদে ঋণ নেওয়ার বিষয়টার সঙ্গে যোগ হয়েছিল ভারতীয় ব্যাংকগুলির নিজের ঋণের খাতাপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলার পথ। এই জন্য তাঁরা পুরনো রুগ্ন ঋণগুলিকে গুটিয়ে নিয়ে নিজেদের ব্যালেন্স সিট প্রায় সাফ

করে এনেছিল তাই এই হাঁফ ছেড়ে বাঁচার সময় তারা নতুন বড়ো ঋণ দিতে খুব একটা উৎসাহী ছিল না। এর ফলে বাইরের দেশের ঋণদান সংস্থাগুলি থেকে ঋণ নেওয়া ভালো বিকল্প হয়ে ওঠে। আর এই কারণেই আজকের হইহট্টগোলের মধ্যেও ভারতীয় ব্যাংকগুলি শান্তিতে বসে আছে, কেননা তারা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় আদানির সংস্থাগুলিকে ঋণ দিয়েছে এবং এ তথ্য তারা আরবিআই-কে দিয়েও দিয়েছে। তাই বলা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত যে আদানির অর্থনৈতিক উত্থান বহির্বিশ্ব থেকে ঋণ নিয়ে ঘটতই। সেখানে মোদী থাকলেই-বা কী না থাকলেই বা কী।

(৪) আরও একটি বিতর্কিত আক্রমণ এলআইসি আদানিকে বিরাট টাকা দাদন দিয়েছে। এই প্রচারটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হিসেবেই প্রমাণিত হয়েছে। এলআইসি সম্পূর্ণ ঋণের পরিমাণের মাত্র ১ শতাংশ আদানিকে দিয়েছে। এবং সেটিও তাদের খাতাপত্তর পরীক্ষা করে শেয়ারের দাম দেখে নয়। এই ধরনের ঋণ এলআইসি-র মতো নন-ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানির পক্ষে অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য কেননা তাদের পলিসি হোল্ডারদের কাছে দীর্ঘকালীন দায়বদ্ধতা রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে ভালো রিটার্ন দেবে এই ধরনের বড়ো কোম্পানিতে ঋণদানই তাদের কাছে লাভজনক ও স্বাভাবিক। বিশেষ করে সেই কোম্পানিগুলি যদি পরিকাঠামো নির্মাণ ক্ষেত্রের হয় যারা দীর্ঘমেয়াদে বড়ো সাফল্য পাবে। এখানে সঠিক সমালোচনা হওয়া উচিত ব্যাংকগুলি ও এলআইসি-র। যখন সরকারের মদতপুষ্ট পাবলিক সেক্টর ব্যাংকগুলির শেয়ার ইস্যু সফলভাবে সাবসক্রাইব করাতে সরকার আদেশ দেয় যেখানে আদানির তো কোনো ভূমিকা থাকে না। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় নিযুক্ত সংস্থাগুলির অভিমত ব্যাংকের আদানির শিল্পোদ্যোগগুলিতে লগ্নির পরিমাণ ০৮-১২ শতাংশ। যদি সর্বাপেক্ষা খারাপ অবস্থায় এই টাকা অনাদায়ীও হয়ে যায় তাতেও ব্যাংকগুলির কিছুই যাবে আসবে না। কেননা ঋণের পরিমাণ সামগ্রিক ঋণের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য।

(৫) অর্থনৈতিক বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা SEBI ও অন্যান্যদের বাজারে কোনো ভুল ভ্রান্তি ঘটলেই দায়ী করে দেওয়া ঠিক নয়। এর কারণ চতুর শেয়ার বিনিয়োগকারী ও ঠগবাজরা সদাই নিয়ন্ত্রকদের থেকে একপা এগিয়ে থাকে। বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজারে ২০০৮ সালের মার্কিন পতন, গ্রিক অর্থনীতির ডামাডোল, ব্রিটিশ পাউন্ডের ১৯৯২ সালে ব্যাপক উত্থান-পতন ভারতের চেয়ে তখনকার দিনে অনেক উন্নত নিয়ন্ত্রক সংস্থার নজরদারিতে ছিল। কিন্তু তারা কিছুই করতে পারেনি। ইউরোপীয় দেশগুলির আজকের ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সেই দেশগুলির অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক কর্তাদের ভূমিকা ব্যর্থ হয়েছে।

শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেমন SEBI ও RBI এদের প্রধান ভূমিকা শেয়ারের কেনা-বেচা অর্থাৎ লেন-দেন স্বচ্ছতার সঙ্গে হচ্ছে কিনা, সেখানে লেনদেনকারীরা টাকা পয়সা ঠিকমতো চোকাতে পারছেন কিনা বা ডিফল্ট হচ্ছে কিনা এগুলি নিশ্চিত করা। আদানি কাণ্ডে তাদের ওপর কোনো দোষ চাপানো যায় না। তাঁদের ভূমিকা ত্রুটিহীন।

(৬) সবচেয়ে দুঃখজনক পরিণতি হতে পারে যদি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আদানিকে বলির পাঁঠা করে তাদের রাজনৈতিক চাল খেলে। যদি সরকারের তরফে এখন প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় যে বিরোধীরা যেখানে সরকারে আছে যেখানে আদানির শিল্প প্রচেষ্টাগুলি কি তারা বন্ধ করবে বা নতুন কিছু খুলতে বাধা দেবে? তাহলে কিন্তু বিষয়টা ভারতের উন্নতির গল্পে কাঁটা দেওয়া Hindenberg-এর হুমকির ঘরানারই হয়ে যাবে।

শিল্পোদ্যোগকে ফুটবলের মতো ব্যবহার করে এর ওর দিকে ঠেললে চাকরি ও দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যেখানে বেসরকারি উদ্যোগের ওপর ভয়ংকর নির্ভরশীল তা যদি আটকে যায় তাহলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতির অন্ত থাকবে না। তাই বারবার বলতে চাই ‘সুট বুটকি সরকার’ বা আদানি-আম্বানিকে বিদ্রূপ করে, ছ্যাবলামির কথা বলে শিল্পপতিদের উদ্যোগ ও তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে দৈত্য বানানো বা তাঁদের সাফল্যকে খাটো করা অত্যন্ত আত্মঘাতী পথ। এক্ষেত্রে আদানি সংস্থার নিয়ামককে বলব তিনিও ৪০০ পাতার rejoinder ছেড়ে পরিস্থিতি নিজের স্বপক্ষে আনার সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারেননি। বরঞ্চ তিনি যদি মাত্র দু'টি লাইন লিখতেন খোলাখুলি সরকার ও সারা ভারতীয় নাগরিকদের উদ্দেশে যে ‘আমি জ্ঞানত কোনো ভুল ভ্রান্তি করিনি। আমি আনন্দিত হব সরকারের তরফে আমার ব্যবসায়ী উদ্যোগের ওপর যে কোনো ধরনের প্রয়োজনীয় তদন্ত করা হোক যে প্রচেষ্টায় আমি ও আমার সংস্থাগুলি সব ধরনের সহযোগিতা করব ও আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হবো।’

(লেখক স্বরাজ্য পত্রিকার এডিটোরিয়াল ডিরেক্টর)

শোকসংবাদ

কলকাতা যাদবপুর শাখার আবাল্য স্বয়ংসেবক যুগলকান্তি দে গত ২৪ জানুয়ারি বিজয়গড় হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। অকৃতদার যুগলদার ছোটোভাই সঙ্ঘের প্রচারক প্রদীপ দে।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক সঞ্জয় মণ্ডলের মাতৃদেবী তরুলতা মণ্ডল গত ৮ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বর্ধমান নগর বিবেকানন্দ প্রভাত শাখার স্বযংসেবক তথা বর্ধমান পূর্বভাগ উপনগর প্রমুখ সুশান্ত বিশ্বাসের মাতৃদেবী ঝর্ণা বিশ্বাস গত ৫ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ১ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

যুদ্ধ থামিয়ে দিক ভারত, আর্জি সারা বিশ্বের

বিশ্বের দরবারে মহাকূটনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথে ভারত। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বর্ষপূর্তির মুখে দাঁড়িয়ে আমেরিকা ও পশ্চিমি দুনিয়া এই ভয়াবহ যুদ্ধ থামানোর জন্য ভারতেরই মুখাপেক্ষী। সম্প্রতি আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সচিবালয় হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কির্বি এক প্রেস বিবৃতিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপরেই ভরসা রাখছেন। একই সঙ্গে কির্বি এও জানিয়েছেন, যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে যে কোনো প্রচেষ্টার পাশে থাকবে আমেরিকা।

এখানেই ভারতের কূটনৈতিক জয় দেখছেন কূটনীতিজ্ঞরা। তাঁরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের আবহে সারা দুনিয়া বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকা যখন রাশিয়াকে একঘরে করার কৌশল নিয়েছিল, তখন তাদের চাপের মুখেও রাশিয়া থেকে তেল কেনা থামায়নি ভারত। এর পেছনে ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থ অবশ্যই ছিল। কারণ স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, রাশিয়া থেকে গত বছরের অক্টোবর পর্যন্ত মোট চাহিদার বাইশ শতাংশ জ্বালানি তেল আমদানি করা হয়েছে।

অন্যদিকে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তথ্যানুযায়ী, গত দশ বছরে ভারতে আমদানি করা অস্ত্রের ষাট শতাংশই এসেছে রাশিয়া থেকে। ইউক্রেনে হামলায় ভারত কেন রাশিয়াকে সহযোগিতা করছে, বিরোধীদের জোটবদ্ধ আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তখন দৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই এই যুদ্ধকে সমর্থন করছে না। কিন্তু দেশের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতির কথা মাথায় রেখেই ভারত যাবতীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। ঠিক এই কারণেই গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর সময় ইউক্রেনে মানবিক ও আর্থিক সাহায্য দিতে এগিয়ে আসে ভারত। কিন্তু বিরোধীরা এতদিন অভিযোগ জানিয়ে এসেছে , ভারত কেন রাশিয়ার আক্রমণের নিন্দা করছে না?

কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজুড়ে খাদ্য ও জ্বালানি সংকট ঘনীভূত হয়েছে। এর মধ্যে রাশিয়াকে বয়কট করে ভারত নতুন করে আর সমস্যা বাড়াতে চায়নি। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী বরাবরই শান্তির পক্ষে তাঁর দেশের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। যেমন গত বছরের সেপ্টেম্বরে উজবেকিস্তানে সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশনের সম্মেলনে তিনি সবার সামনেই রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনকে বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতি যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত নয় বলে বার্তা দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনেও মোদী ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ থামানোর উপায় বাতলানোর কথা বলেন। অর্থাৎ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত একতরফা ভাবে রাশিয়াকে দায়ী না করলেও শান্তিকামী অবস্থানের প্রতি তার অবস্থান স্পষ্ট করেছে।

কূটনীতিকরা মনে করছেন, ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক সুদীর্ঘকালের। এই কূটনৈতিক সম্পর্ককে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ছিন্ন করতে চায়নি। বরং বিশ্বজোড়া আর্থিক মন্দার পরিপ্রক্ষিতে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যে মনোযোগ দিয়েছিল। তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে সাংহাই কর্পোরেশনের ওই সম্মেলনে। সেখানে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের উদ্বেগের স্বীকার করে নেওয়ার পাশাপাশি পুতিন ভারতের বাজারে রাশিয়ার সার আগের তুলনায় আটগুণ বেশি পৌঁছানোয় ভারতীয় প্রশাসনের ওপর বিশেষ সন্তোষ ব্যক্ত করেছিলেন। বিশেষ করে, ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা ও পশ্চিমি দুনিয়ার নিষেধাজ্ঞার জন্য অর্থনৈতিক ভাবে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছিল রাশিয়া। সেক্ষেত্রে ভারতই তখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়াকে অক্সিজেন জুগিয়ে এসেছে। রুশ বার্তা সংস্থা তাসকের হিসাবানুযায়ী, ২০২১ সালে ভারত রাশিয়ার মধ্যে যেখানে বাণিজ্য হয়েছিল ১৩৬০ কোটি টাকা, সেখানে গত বছরের শুধু জুলাইয়ে দু'দেশের বাণিজ্য ১১০০ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। দু'দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কে এই অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককেও নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে।

ভারতে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত ডেনিস অলিপভের মুখেও গত উজবেকিস্তানের সম্মেলনেই শোনা গিয়েছিল ভারত-রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতির সুর। অন্যদিকে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক অনকদিনই খারাপ। এখন রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে তারাও কূটনৈতিকভাবে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছে। মোদীর চালে সবমিলিয়ে সারা বিশ্বেই বড়ো কূটনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ভারত। অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের গবেষক বিবেক মিশ্রও মনে করেন, যুদ্ধ থামাতে ভারতের আগ্রহের সঙ্গে রাশিয়া কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণেই সহমত হয়েছে। এই পরিস্থিতির সুযোগ ভারতকে নিতে হবে।

যাই হোক, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামবে কিনা কিংবা ভারত তাতে কীরকমভাবে মধ্যস্থতা করবে সময়ই তার উত্তর দেবে। তবে আপাতত গোটা দুনিয়া ভারতের কূটনৈতিক শক্তি যাচাই করে নিল। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

এবার হিন্দুদের নিজের একটা দেশ হোক

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

ভারতের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল আজকাল তিনটি মৌলিক বিষয়কে সংবিধানের মূল স্তম্ভ বলে প্রচার করে থাকে--- গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ১৯৫০ সালে বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রণীত সংবিধানে কিন্তু সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই শব্দ দুটি ছিল না। ১৯৭৬-এ ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে এ দুটি শব্দ অন্তর্ভুক্ত করেন। আশ্চর্যের কথা, এই দুটি বিষয়ই নির্ভর করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসংখ্যার ওপর। ভারতীয় উপমহাদেশে যেখানে হিন্দুর সংখ্যা কম যেমন আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ--- সেখানে এই তিনটি বিষয় উধাও। এমনকী ওই দেশগুলিতে আজ এসব কথা বলারও লোক নেই। ওই দেশগুলি ভারত ভেঙে তৈরি হলেও সেগুলি আজ ইসলামিক থিয়োক্রেটিক স্টেট। যদি আজ কেউ প্রশ্ন করে ভারত ভেঙে তৈরি হওয়া মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশ না হয়ে ইসলামিক দেশ হয়ে গেল, অপরদিকে অবশিষ্ট হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষ কেন হিন্দুদেশ হলো না? এদেশের এক শ্রেণীর মানুষ সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে দেবে।

অবশ্য বর্তমানে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর সারা দেশে হিন্দু, হিন্দুত্ব, হিন্দুরাষ্ট্রের চর্চাও শুরু হয়েছে। ২০১৮-র ১০ ডিসেম্বর মেঘালয় হাইকোর্টের বিচারপতি সুদীপ রঞ্জন সেন একটি প্রশ্ন তুলেছিলেন। একটি জাজমেন্টে তিনি বলেছিলেন— 'দেশ ভাগের পর পাকিস্তান নিজেকে একটি ইসলামিক দেশ হিসেবে ঘোষণা করেছে। ভারত যেহেতু ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়েছিল তবে তাকে হিন্দু দেশ হিসেবে ঘোষণা করা উচিত, অথচ ভারত আজও একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে রয়ে গেছে।' শুধু বিচারপতি সেনই নন, অনেকেই আজ এ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন।

অবশ্য বিরোধীরাও বসে নেই। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি থেকে শুরু করে এদেশের আঠারো-কুড়িটি রাজনৈতিক দল উচ্চস্বরে এর প্রতিবাদে শামিল। তাদের বক্তব্য মোদী-যোগী জুটি এদেশের মৌলিক স্তম্ভগুলিকে ধ্বংস করে এ দেশকে ধীরে ধীরে হিন্দুরাষ্ট্রের দিকে নিয়ে চলেছে। যেন ভারত হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষিত হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে। ভারতের সুনাম, ঐতিহ্য সব ধুলায় মিশে যাবে, বিশ্বের দরবারে ভারত তার শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান হারাবে!

কিন্তু প্রকৃত ছবিটি কী? প্রথমেই ধারা যাক বর্তমানের নেপাল দেশটির কথা। যেটি এই সেদিন পর্যন্তও পৃথিবীর একমাত্র ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্র ছিল, কই সেদিন তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি? আজ শ্রীলঙ্কা, জাপান, ভুটান, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সরকারি ধর্ম হলো বৌদ্ধ, কই কেউ তো তার জন্য তাকে দুয়ো দেয় না। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ যুগ যুগ ধরে খ্রিস্টান দেশ— তখন তো বিশ্ব রসাতলে যায়নি। ইরানে ইসলামি আগ্রাসনের পর সেদেশ থেকে সূর্য উপাসক পার্শিদের মেরে কেটে তাড়িয়ে ইসলামিক দেশ ঘোষণা করা হয়েছে, তখন তো বিশ্বে প্রলয় আসেনি। ইহুদিরা দু' হাজার বছর পর তাদের নিজের দেশ ইজরায়েল ফিরে পেয়ে ইহুদি ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দিয়েছে— তখন তো বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যায়নি। এমনকী এই সেদিন ১৯৪৭-এ ভারত ভেঙে তৈরি হওয়া পাকিস্তান, বাংলাদেশ যখন নিজেদের ইসলামিক দেশ বলে ঘোষণা করলো— সেদিনও কেয়ামত আসেনি, অথচ হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সনাতন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষকে কেউ যদি হিন্দুস্থান বলে ডেকে ফেলে, এদেশের বুদ্ধিজীবী, সেকুলার রাজনীতিজীবী বাবুদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে পাকিস্তান বানালে আপনি সেকুলার, কিন্তু যেই আপনি দ্বিজাতিতত্ত্ব নামক কয়েনের উলটো পিঠে থাকা বাকি হিন্দুগরিষ্ঠ ভারতকে হিন্দু দেশ করতে চাইবেন অমনি আপনি হয়ে যাবেন চরম সাম্প্রদায়িক। যে মুসলমানেরা হিন্দুর সঙ্গে একত্রে থাকলে তাদের ধর্ম বিপন্ন হবে বলে দেশভাগ চাইলো, দেশভাগের পর তাদের বেশিরভাগটাই পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতেই থেকে গেল, তাদের কিছুই হারাতে হলো না। পাকিস্তান আর বাংলাদেশ দুটি ইসলামিক দেশ রইলো তাদের ফিক্সড ডিপোজিট, কেবলমাত্র হিন্দুদের যৌথ সম্পত্তিটা সবার ভাগ করে খাওয়ার, এরই নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। আমাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দুই নেতা নেহরু আর গান্ধীজীর কথায় ভারত হয়ে গেল ভেস্টেড ল্যান্ড, খাস জমি— এতে সবার মালিকানা, সকলের লুটে খাওয়ার দেশ, এরই নাম সেকুলারিজম।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর জিন্না তার এক ভাষণে বলেছিলেন, 'মুসলিম লিগের নেতৃত্বে মুসলমানরা যে এতবড়ো লড়াই করেছে তা কি এই পোকায় কাটা এক টুকরো পাকিস্তান হাসিল করার জন্য? আমাদের লক্ষ্য অনেক বড়ো। সারা ভারতকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা আমাদের পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য।' পরবর্তী পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোও সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন--- 'দরকারে আমরা ভারতের সঙ্গে এক হাজার বছর যুদ্ধ করবো'। তাঁর কন্যা বেনজির ভুট্টোও প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসে মুসলমান সমাজকে সেই কথা পুনঃস্মরণ করিয়েছিলেন। তাদের সেই সদম্ভ ঘোষণা যে মিথ্যা ছিল না আজ তার প্রমাণ মিলেছে হাতেনাতে। এই কয়েক মাস আগে সারা দেশের প্রায় ৫০টি স্থানে পিএফআই-র কার্যালয়ে হানা দিয়ে এনআইএ পেয়েছে প্রচুর নথি। তাতে আছে ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষ ২০৪৭-এ এদেশকে ইসলামি দেশ বানানোর ব্লুপ্রিন্ট। অর্থাৎ হিন্দুস্থানকে মোগলিস্তান বানানোর সুনির্দিষ্ট চক্রান্ত চলছে এ দেশের মাটিতে বসেই। এ মোটেই অবাক করার বিষয় নয়। স্বাধীনতার

দিন থেকেই এই ধারা চলে আসছে। কখনও কাসবের নেতৃত্বে মুম্বাই হামলা, কখনও আফজল গুরুর নেতৃত্বে সংসদ ভবনে আক্রমণ, কখনও-বা মন্দিরে মন্দিরে বোমা বিস্ফোরণ। এই তো বছর তিনেক আগে সিএএ-র বিরুদ্ধে ট্রেনে-বাসে- দোকানে-অফিসে আগুন-লুটপাট কী না দেখেছি আমরা। ক'মাস আগে নূপুর শর্মার এক বক্তব্যের বিরুদ্ধে দেখেছি দেশ জুড়ে সশস্ত্র হিংসাত্মক আন্দোলন— 'গুস্তাখ-এ-রাসুল কি একই সাজা— সর তন সে জুদা, সর তন সে জুদা' করার অঙ্গীকার, শেষ পর্যন্ত এক হিন্দুর গলা কেটে তার সফল পরীক্ষাও হলো। সাধারণতন্ত্র দিবসে আলিগড় মুসলিম ইউনির্ভাসিটিতে স্লোগান উঠলো— 'নারায়ে তকবীর আল্লাহ আকবর' অর্থাৎ জিন্নার সেই অপূর্ণ স্বপ্ন সফল করতে শুধু যে বিদেশি শত্রুরা সক্রিয় তাই নয়, সেই বিদেশি শত্রুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিঃশব্দে সন্তর্পণে স্লিপার সেল হিসেবে কাজ করে চলেছে এদেশেরই কিছু মানুষ। প্রধানমন্ত্রী মোদীজী কিছুদিন আগে বিদেশি শত্রুদের সঙ্গে দেশের কোণে কোণে বসে থাকা এই শত্রুদের সঙ্গে লড়াইয়ের কথাই বলেছিলেন। ঠিক যেমন ভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতও বলেছিলেন ঘরের ভিতর বাস করা এই শত্রুদের সম্বন্ধে সজাগ থাকতে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় এদেশে যে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১০ শতাংশ, আজ ২৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। আর বিপরীতে সেদিন যে হিন্দুরা ছিল ৮৫ শতাংশ, আজ তারা কমতে কমতে প্রায় ৭৮ শতাংশে ঠেকেছে। আজ ২৫ শতাংশ মুসলমান যদি ৭৫ শতাংশের ওপর এমন হিংসাশ্রয়ী হতে পারে, তবে যেদিন এরা ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে সেদিন এদেশের হিন্দুদের কী দুর্দশা হবে তার হাতে গরম উদাহরণ আজকের আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ।

ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। কিন্তু এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু আজও সেই আসন্ন বিপদের আঁচ অনুভব করছে না। তারা যেন সুকুমার রায়ের বাবুরাম সাপুড়ের সেই নির্জীব সাপটি— যে সাপের চোখ নেই, শিং নেই, নখ নেই, কাউকে কাটতে জানে না, ফোঁস ফাঁস করতেও সে ভুলে গেছে, উৎপাতহীন দুধ-ভাতের জীবনই যার পছন্দ। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে সংখ্যাই যে শেষ কথা বলে, কে তাদের বোঝাবে? সেখানে ৫টি গ্র্যাজুয়েটের থেকে ২৫টি ইডিয়টের মূল্য যে বেশি। কারণ ৫টি শিক্ষিত বুদ্ধিমানের ৫টি ভোট, আর ২৫টি অশিক্ষিত মূর্খের ভোট ২৫টি। ভোট বেশি যার সরকার তার। তাই অদূর ভবিষ্যতে যদি এদেশে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে সংখ্যালঘুদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি করতেই হবে। 'জন্মনিয়ন্ত্রণ', 'হাম দো হামারা দো', 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার', সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করতে হবে'— এসব ছেঁদো স্লোগান তাদের জন্য নয়। বরং তার জায়গায় 'নারী হলো শস্যক্ষেত্র' থিয়োরিই প্রধান। তাই আমাদের 'হাম দো হামারা দো'-এর বিপরীতে তাদের স্লোগান হলো 'হাম পাঁচ, হামারা পঁচিশ'। সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে দার-উল-হারব ভারতকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করার এ এক উর্বর আবাদ পদ্ধতি।

হিন্দুধর্মে সেমেটিক উগ্রতা কখনোই ছিল না। হিংসা, হানাহানি হিন্দুর রক্তে নেই। এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তাই সে অন্য এক পথ বেছে নিয়েছে। নরেন্দ্র মোদীকে পরপর দু'বার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসিয়েছে তারা। ধর্মান্ধ আগ্রাসন থেকে নিজে, নিজের পরিবার ও দেশ বাঁচাতে মোদী সরকারকেই তারা হাতিয়ার করেছে। এক স্বপ্নে তারা বুক বেঁধেছে। স্বপ্নটি হলো ভারত হবে 'হিন্দু রাষ্ট্র'। যে রাষ্ট্রে বিশ্বের ১৫০ কোটি হিন্দু খুঁজে পাবে তার নিজের 'হোমল্যান্ড'। যে রাষ্ট্রে হিন্দুরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে— কেউ তাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাতে সাহস পাবে না। যে দেশে হিন্দু হওয়ার অপরাধে গুলিতে ঝাঁঝরা হতে হবে না। ঋষি কশ্যপের ভূমি কাশ্মীরের কোনো হিন্দু পণ্ডিতকে চরম অপমানকর 'জিম্মি- কাফের' উপাধি নিয়ে, জিজিয়া কর দিয়ে পশুতর জীবন কাটাতে হবে না, যে দেশে তার বসত বাটিটি 'শত্রু সম্পত্তি' বলে বিবেচিত হবে না, যে দেশে আসলামের চার বিবি আর চব্বিশটি বাচ্চার সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে হবে না সুমন্ত, সুমিতা আর তার সন্তানকে, যে দেশে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের নির্যাতিত হিন্দু তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে তার পূর্বপুরুষের আচারিত ধর্ম বাঁচাতে নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধতে পারবে, যে দেশ হবে পৃথিবীর সকল হিন্দুর শেষ আশ্রয়স্থল, সেই হিন্দুরাষ্ট্রই তার স্বপ্ন। বরং হিন্দুরাষ্ট্রে থাকবে সকলের সমান অধিকার, কিন্তু কাউকে তোষণ নয়। এমনই এক দেশের স্বপ্ন এদেশের হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে বুকে বয়ে বেড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আজ পরীক্ষা তাঁর দেশবাসীরা সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন কিনা। ইতিমধ্যেই সিএএ-কে আইনে পরিণত করে এবং এনআরসি করার অঙ্গীকারের মাধ্যমে মোদীজী তার কিছু ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

২৫০ কোটি খ্রিস্টানদের জন্য বিশ্বে ১৫টিরও বেশি খ্রিস্টান দেশ আছে, ২০০ কোটি মুসলমানের জন্য বিশ্বে আছে ৫২টি মুসলমান দেশ, ৫০ কোটি বৌদ্ধের জন্য বিশ্বে আছে ১৭টিরও বেশি বৌদ্ধ দেশ, এমনকী ১ কোটির কম ইহুদির জন্য বিশ্বে একটি ইহুদি দেশও আছে; শুধু ১৫০ কোটি হিন্দুর জন্য কোনো 'দেশ' নেই। তারা হলো দেশহীন জাতি। যেন তাদের নিজের দেশ থাকা অন্যায়, অপরাধ। তারা পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ। আজ এই লজ্জাজনক পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে হবে।

লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের বাঁচাতে দেশে সরকার অভয়ারণ্য তৈরি করে। হিন্দুদের বাঁচাতে এদেশে এক অভয়ারণ্য গড়ে তুলতে হবে। যার নাম হোক 'হিন্দুরাষ্ট্র ভারত'। কিন্তু বেশি সময় হাতে নেই। দেরি হলে হয়তো হিন্দু জাতিকে বাঁচানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। □

ভুল সংশোধন

গত ৬ ফেব্রুয়ারি উত্তর সম্পাদকীয়তে প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামের শেষ স্তবকে পড়তে হবে '১৯৪৮, ১৯৬৮' এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একেবারে শেষেপড়তে হবে 'আরও এক কদম এগিয়ে যাবে'। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। স্ব: স:

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় দুর্নীতির ঘুণপোকা

দীপ্তাস্য যশ

গ্রামীণ ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে ৭৩তম সাংবিধানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধানে স্বীকৃত করা হয় ১৯৯৩ সালে। ভারতবর্ষের যে উন্নয়নের রূপরেখা তা অনেকাংশেই নির্ভরশীল এই পঞ্চায়েতি সংগঠন এবং পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার উপরে। প্রাচীনকাল থেকে স্থানীয় স্তরের উন্নয়নের জন্য যে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো আমাদের দেশে অনুসৃত হয়ে এসেছে সেই ব্যবস্থাই নানাবিধ পরিবর্তন ও বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার আকার ধারণ করেছে। এই ব্যবস্থার বীজ আমাদের দেশে সেই হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার সময় থেকেই অনুসৃত হয়ে আসছে। বস্তুত ভারতের মূল যদি তার গ্রামে নিহিত থাকে তাহলে সেই গ্রামীণ ভারতকে স্বনির্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করার কাজটি অনেকাংশেই পঞ্চায়েতের উপর নির্ভরশীল।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৮ শতাংশ গ্রামে বসবাস করেন বা বলা যায় সরাসরি পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত বা বলা ভালো এর দ্বারা প্রভাবিত। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসমে সবথেকে বেশি সংখ্যক মানুষ পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার আওতাভুক্ত, যদি জনঘনত্বের নিরিখে বিচার করা হয়। গ্রামগুলির কৃষিসংক্রান্ত পানীয় জল, রাস্তা এবং অন্যান্য পরিকাঠামো, বৈদ্যুতিকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নিকাশি ব্যবস্থা, পরিবার কল্যাণ, নারী এবং শিশু কল্যাণ-সহ প্রায় সবকিছুই এই পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এমনকী গ্রামীণ সংস্কৃতি, শিক্ষা ইত্যাদিও পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ গ্রামীণ জনজীবনের প্রায় সবটাই এই পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেই কারণেই আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদি সংক্রান্ত যা কিছু পরিকল্পনা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার গ্রহণ করে তা মূলত গ্রামকেন্দ্রিক হয়।

ভারতে আড়াই লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত, সাড়ে ছয় হাজারেরও বেশি পঞ্চায়েত সমিতি এবং সাড়ে ছয়শোর কাছাকাছি জেলা পরিষদ তিন লক্ষেরও বেশি নির্বাচিত সদস্যর দ্বারা এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অভিভাবকত্বে। গ্রামের মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ক্ষেত্রে এই পঞ্চায়েতগুলির প্রভাব কী অপরিসীম তা এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়। ভারতের উন্নতির জন্য প্রয়োজন ভারতের গ্রামের উন্নয়ন। আর সেই গ্রামের উন্নয়নের প্রায় পুরোটাই নির্ভরশীল এই পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার উপরে।

পশ্চিমবঙ্গও বাকি ভারতের থেকে আলাদা নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গে এই পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতা কিছু বেশিই। ২০১১ সালের শেষ জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার প্রায় সত্তর শতাংশই গ্রামে বসবাসকারী এবং প্রত্যক্ষভাবে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার দ্বারা তাদের জীবন প্রভাবিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত, সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি পঞ্চায়েত সমিতি এবং

বাইশটি জেলা পরিষদের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজটি পরিচালিত হয়।

বর্তমানে বিভিন্ন যোজনা যেমন একশো দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশন, জল জীবন মিশন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনা, গরিব কল্যাণ যোজনা ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এই পঞ্চায়েতগুলির দ্বারাই পরিচালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩১৭৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে যেগুলির জনসংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি, সারা দেশের মধ্যে যা সর্বাধিক। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন উন্নয়নের নিরিখে পরিমাপের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের কাজের পর্যালোচনা করা জরুরি তেমনই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও বর্তমানের চিত্রটি পর্যালোচনা করা অতীব প্রয়োজনীয়। বিশেষত পঞ্চায়েতকে ঘিরে নিত্যনতুন দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসাই যখন বর্তমানে দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্চায়েতের কাজের পরিধি বিপুল আমরা আমাদের পর্যালোচনার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পকেই প্রাথমিক ভাবে বেছে নেব। বিশেষত যে প্রকল্পগুলির প্রভাব সর্বাধিক। তাই আমরা নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলির পরিসংখ্যান এবং তথ্যগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করব আমাদের পর্যালোচনার কাজটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে—

(১) একশো দিনের কাজ।

(২) আবাস যোজনা।

(৩) প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা।

এই পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আমরা মূলত ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবং পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত দপ্তর মারফত প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগুলিই বিবেচনা করব।

একশো দিনের কাজ

গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এযাবৎ প্রায় ১৬ কোটি জব কার্ড ইস্যু করেছে একশো দিনের কাজের ক্ষেত্রে। ২১-২২ সালের বাজেটে এই খাতে প্রায় ৯৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তির পরিমাণ সাত হাজার পাঁচশো কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য মোতাবেক ৩১ মার্চ ২০২২ অবধি প্রায় মোট ৩৬.৪২ কোটি কার্য দিবস সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রায় এক কোটি এগারো লক্ষ মানুষ এই প্রকল্পে কাজ পেয়েছেন। যার ফলে প্রায় ৭৬ লক্ষ পরিবার উপকৃত হয়েছে। ন্যূনতম ৪৮ দিন করে এক একজন কাজ পেয়েছেন। ৭৬ লক্ষ পরিবারের মধ্যে সাড়ে চার লক্ষের কিছু বেশি পরিবার একশো দিন কাজ পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ এই পরিসংখ্যান পেশ করে নিজেদের সাফল্যই দাবি করেছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র কি তা বলছে? হিন্দুস্থান টাইমসে ২৪ ডিসেম্বর ২০২২-এ প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একশো দিনের কাজের যে দুর্নীতি হয়েছিল তার বাবদ প্রায় ৫২ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে একশো দিনের কাজের দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি অভিযোগের প্রাপ্তি স্বীকার করেছে। এই অভিযোগগুলি মোতাবেক দুর্নীতির পরিমাণ প্রায় ২৫০ লক্ষের কাছাকাছি। কেন্দ্র সরকারের গ্রমোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে এর আগে ২০১৯ এবং ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় পরিদর্শক দলও পশ্চিমবঙ্গে ঘুরে যাওয়ার পরে নানাবিধ দুর্নীতি সংক্রান্ত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেয়। সেই তদন্ত রিপোর্ট মোতাবেক কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তদন্তের নির্দেশ দেয় এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর কোনো উত্তরই কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়নি। এরপর যখন আরও নানাবিধ দুর্নীতির অভিযোগ একশো দিনের কাজ ঘিরে উঠে আসে তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং জানায় তারা বাহান্ন লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে। এর মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে উদ্ধার হয় ১৯.১২ লক্ষ টাকা, উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে উদ্ধার হওয়া অর্থের পরিমাণ ১০.৫৮ লক্ষ টাকা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে এই টাকার পরিমাণ ৯.৭১ লক্ষ টাকা।

প্রশ্ন হলো, দুর্নীতি কি এই ৫২ লক্ষেই সীমাবদ্ধ নাকি দুর্নীতির পরিমাণ আরও বেশি? যেভাবে একের পর এক জেলা থেকে প্রতিদিন নিত্যনতুন দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসছে তাতে আশঙ্কা হয় এই দুর্নীতির পরিমাণ কয়েক হাজার কোটি টাকা। একশো দিনের কাজের আইনের আওতায় প্রত্যেক গ্রামপঞ্চায়েতের প্রতি ছয় মাসে অন্তত একবার অডিট অর্থাৎ খরচের হিসেব করার কথা। পশ্চিমবঙ্গের একটিও পঞ্চায়েতে ২০২১-২২ সালে হিসেব নিকাশ করা হয়নি একশো দিনের কাজের ক্ষেত্রে। এমনকী এই আইনের আওতায় প্রতি জেলায় যে একজন মুখ্য আধিকারিক নিয়োগ করার কথা, একশো দিনের কাজের তদারকির জন্য, পশ্চিমবঙ্গে সে নিয়োগও হয়নি। সেই কারণেই একশো দিনের কাজের আইনের ধারা ২৭ অনুযায়ী কেন্দ্র সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুদান দেওয়া বন্ধ করেছে।

বস্তুত এই দুর্নীতির আয়তন বিশাল। একদিকে যেমন কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে বঞ্চনার অভিযোগ আছে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলির বিরুদ্ধে, তেমনই হিসেবের ক্ষেত্রেও নানাবিধ কারচুপির অভিযোগ বারেবারে উঠে এসেছে। বহু মানুষ আছেন যারা এযাবৎ একশো দিনের কাজ পাননি। আবার বহু ক্ষেত্রে অভিযোগ, তৃণমূলের নেতারা গরিব মানুষের জব কার্ড হাতিয়ে নিয়ে সেই জব কার্ডের ভিত্তিতে কাজ দেখিয়ে একশো দিনের কাজের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর-সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই এমন অভিযোগ বারেবারে উঠেছে। কেন্দ্রীয় পরিদর্শক দলের রিপোর্ট মোতাবেক ১৬টি জেলায় একশো দিনের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। তবে দুর্নীতির পরিমাণ ঠিক কতটা তা বোঝার জন্য একটি পরিসংখ্যানই যথেষ্ট।

বর্তমানে তৃণমূলের এই চুরি আটকানোর জন্য কেন্দ্র সরকার নিয়ম করেছিল প্রতিটি জব কার্ডকে আধারের সঙ্গে লিঙ্ক করাতে হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের মধ্যে। এই লিঙ্ক প্রক্রিয়া প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পূর্ণ হবার পরে জানা গেল তার মধ্যে ৪ লক্ষ ৯ হাজার ৫৩১ জনের জব কার্ড ভুয়ো, অর্থাৎ এই জব কার্ড হোল্ডারদের কোনো অস্তিত্বই বাস্তবে নেই। কিন্তু এদের নাম করে নিয়মিত টাকা তোলা হচ্ছিল। এবার ভাবুন একবার দুর্নীতির পরিমাণটা ঠিক কত। ৪৯১৫৩১ জব কার্ড প্রতি বছর ২৩ হাজার টাকা করে দশ বছরের

হিসেব ঠিক কতো দাঁড়ায়? আমার মতো সাধারণ মানুষের আয়ত্বের বাইরে এই হিসেব। সাধারণ ভাবে মনে করা হচ্ছে একশো দিনের কাজে দুর্নীতির পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

বেনিয়মের এখানেই শেষ নয়। যেমন একশো দিনের কাজে নিয়ম হচ্ছে কেউ যদি একশো দিনের কাজ চেয়ে পঞ্চায়েতে আবেদন করেন তাহলে তাকে ১৫ দিনের মধ্যেকাজ দিতে হবে। আর যদি কাজ না দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে তাকে বেকার ভাতা দিতে বাধ্য রাজ্যসরকার। পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যারা এযাবত একটি টাকাও বেকারভাতা দেয়নি।

খুবই স্বাভাবিক যখন দুর্নীতির বহর এতো বেশি তখন প্রকল্পের উদ্দেশ্যেও পূরণ হবে না। ঠিক যেমন একশো দিনের কাজের প্রকল্পের আওতায় উত্তরপ্রদেশে ২৯.১৪ শতাংশ তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের জন্য কাজের দিন তৈরি করা গেছে, পশ্চিমবঙ্গে তা ২০.৮৬ শতাংশ। জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জন্য গুজরাট ৪৪.০৩ শতাংশ কাজের দিন তৈরি হয়েছে, অথচ পশ্চিমবঙ্গে এই পরিমাণ মাত্র ৭.৪৬ শতাংশ। কেরলে মহিলাদের জন্য কাজের দিন নির্ধারিত হয়েছে প্রায় ৮৯.৪৩ শতাংশ, কর্ণাটকে প্রায় ৫৫.১৫ শতাংশ, গোয়াতে ৭৯.৬২ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে তা মাত্র ৪৭.৯৭ শতাংশে সীমাবদ্ধ।

এই তথ্য ও পরিসংখ্যান থেকেই পরিষ্কার, যে উদ্দেশ্যে একশো দিনের কাজের প্রকল্প চালু হয়েছিল, বেলাগাম দুর্নীতি ও বেনিয়মের জেরে তা আজ কানাগলিতে পথ হারিয়েছে।

আবাস যোজনা

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত স্তরে এই মুহূর্তে সব থেকে আলোচিত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সংক্রান্ত দুর্নীতি। প্রায় প্রতিদিন নিত্যনতুন দুর্নীতির খবরের শিরোনামে উঠে আসছে। এই দুর্নীতি নিয়ে সরকারের অস্বস্তি বর্তমানে এতোটাই যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনুরোধ করছেন তদন্তকারী কেন্দ্রীয় দল পাঠানোর জন্য। কিন্তু

> “তৃণমুলের লক্ষ্য হবে যেনতেন প্রকারেণ পঞ্চায়েতগুলিকে কবজা করে দুর্নীতর ঠেলাগাড়ির গতি অপ্রতিহত রাখা।”

মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন সরকার এতো বিশাল পরিমাণ দুর্নীতি এই প্রকল্পকে ঘিরে করেছে যে এই দুর্নীতির সার্বিক তদন্ত অবশ্যই প্রয়োজন।

সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যাচ্ছে ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ সালে যথাক্রমে প্রায় ২৫ লক্ষ, ৫৭ লক্ষ এবং ৪১ লক্ষ বাড়ি আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছে পুরো দেশে। রাজ্য সরকার সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যাচ্ছে অনুমোদনের প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই বাড়ি তৈরির কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

এবার রাজ্য সরকারের তরফে অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার। কিন্তু হঠাৎ এই অভিযোগ ওঠার কারণ কী? সম্ভবত ২০২১-২২ সালে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আটকে যাওয়াই এই অভিযোগের মূল কারণ।

প্রথমত, এমন অভিযোগ ওঠারই কথা নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ২১ সালের বিধানসভা ভোটের সময় আমাদের সগর্বে জানিয়েছিলেন তিনি কেন্দ্রের উপরে নির্ভরশীল নন। বাড়ি তৈরির এক টাকাও কেন্দ্র দেয় না, পুরোটাই তিনি দেন। তাই এই প্রকল্পের নাম 'বাংলার বাড়ি'। খুবই ভালো কথা, এতো বড়ো একটি প্রকল্প রাজ্য সরকার নিজেই চালাচ্ছে, তারা কারুর উপরে নির্ভরশীল নয়। তাহলে এখন কেন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রশ্ন উঠছে? আসলে এই প্রকল্পে একটি টাকাও পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেয় না। পুরোটাই বরাদ্দ হয় কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তর মারফত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) প্রকল্পের মাধ্যমে। ২০২৫ সালে দেশের সব মানুষকে পাকা বাড়ির বন্দোবস্ত করে দেওয়ার যে প্রকল্প তারই অধীনে এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)।

এই প্রকল্পের কাজটি একেবারে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সমীক্ষার মারফত হয়। পঞ্চায়েতগুলি যে নামের তালিকা তৈরি করে তা পুনর্মূল্যায়ন করা হয় বিডিয়ো দপ্তরের মাধ্যমে। তারপরে সেই তালিকা যায় জেলা প্রশাসনের কাছে। জেলা প্রশাসন সেই তালিকা পর্যালোচনা করার পরে তা কেন্দ্র সরকারের সাইটে তথ্য আপলোড করা হয়। অর্থাৎ পুরো প্রকল্পটির সাফল্য ও স্বচ্ছতা নির্ভর করছে রাজ্য এবং রাজ্যের অধীন পঞ্চায়েত দপ্তরের উপরে। তৃণমূলের অধীন পঞ্চায়েতগুলি বা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার কি সেই দায়িত্ব পালন করেছে?

আবাস যোজনা ঘিরে রাশি রাশি অভিযোগের মেলা দেখেই বোঝা যায় তৃণমূলের অধীন পঞ্চায়েতগুলি বা মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার সেই দায়িত্ব পালন করেনি, বরং দুর্নীতিই তাদের লক্ষ্য ছিল। দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান, তাদের আত্মীয়, তৃণমূলের ছোটো-বড়ো-মেজ নেতা সবাই আবাস যোজনার লিস্ট আলো করে বসে আছেন তাদের নিজস্ব পাকা বাড়ি থাকার পরেও। এমনকী যে নেতারা চারতলা মার্বেল বসানো বাড়ি আছে তারও নাম আছে আবাস যোজনার লিস্টে।

এখন নিজেদের দুর্নীতি ঢাকা দেওয়ার জন্য মমতা ব্যানার্জি বলছেন বিজেপিই নাকি আবাস যোজনার লিস্টে ভুল নাম ঢুকিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রকল্প বন্ধ করে দিতে চাইছে। মমতা ব্যানার্জির এমন হাস্যকর অভিযোগ শুনলে ঘোড়াতেও হাসবে। লিস্টে নাম তুলছে তৃণমূলের অধীন পঞ্চায়েত, তা

ভেরিফাই করছে তার অধীন পঞ্চায়েত দপ্তর, বিডিয়ো এবং জেলা প্রশাসন, আর দুর্নীতি করছে বিজেপি! এমন হাস্যকর অভিযোগ করতেও দক্ষতা লাগে। আবাস যোজনা ঘিরে সবথেকে বেশি অভিযোগ তো এসেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে। সেখানেই না সবথেকে বেশি সংখ্যক পঞ্চায়েত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা নিয়ে তৃণমূল আজও গর্ব করে?

আবাস যোজনাকে ঘিরে সীমাহীন দুর্নীতির জেরে পশ্চিমবঙ্গে আজ আবাস যোজনার মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হতে বসেছে। ওড়িশা যেখানে সাইক্লোন বিধ্বস্ত অঞ্চলে এই আবাস যোজনা প্রকল্পের অধীনে সব বাড়িকে পাকা বাড়িতে রূপান্তরিত করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিপুলভাবে কমিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সেখানে আজও আমফান বিধ্বস্ত জনপদগুলির ক্ষতিপূরণ করা যায়নি।

এই প্রকল্পের অধীনে ২০১৮-১৯ সালে উত্তর প্রদেশে যেখানে মাত্র তিন লক্ষের কিছু বেশি বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে সেই সময়ে প্রায় ছ' লক্ষের বেশি বাড়ি অনুমোদন করা হয়েছে। ২০২০-২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে প্রায় দশ লক্ষের কাছে বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, সেই বছরে উত্তরপ্রদেশে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সাত লক্ষ বাড়ির, মধ্যপ্রদেশে অনুমোদন পেয়েছে ছ' লক্ষের কাছাকাছি বাড়ি। কাজেই বঞ্চনার অভিযোগের সপক্ষে কোনো যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা থেকে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতগুলির চুরির স্বপক্ষে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় সারা দেশে এযাবৎ প্রায় ৭৮৭, ৯১৮ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৭২৫১৭২ কিলোমিটার রাস্তা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে এই যোজনার অধীনে ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ সালে যথাক্রমে ৩৬,৮০৭ কিলোমিটার, ৩৬, ৮০২ কিলোমিটার এবং ৩৬,৭৯৩ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে কেন্দ্র সরকারের তরফে।

এক্ষেত্রেও টাকা কেন্দ্রের, প্রকল্প সম্পাদনের দায়িত্বে রাজ্যের অধীন পঞ্চায়েতগুলি। মমতা ব্যানার্জি অবশ্য নিজের নামের স্টিকার যথারীতি সেঁটে দিয়েছেন। কিন্তু দুর্নীতির আটকানোর ব্যাপারে সেই পরিমাণ আগ্রহ মমতা ব্যানার্জির তরফ থেকে দেখা যায়নি। মমতা ব্যানার্জির দাবি কেন্দ্রের থেকে রাজ্যের প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা প্রাপ্য। প্রথমত আবারও একই প্রশ্ন উঠবে। এতোদিন তো তিনি বলে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা রাজ্যের প্রয়োজন নেই, 'বাংলার সড়ক' প্রকল্পের আওতাতেই নাকি সব রাস্তা তিনি তৈরি করে ফেলবেন। তাহলে এখন কী করে কেন্দ্রের কাছে সতেরো হাজার কোটি টাকা বকেয়া হয়? অর্থাৎ তিনি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনাকেই বাংলার সড়ক প্রকল্প নাম দিয়ে চালাচ্ছিলেন।

আর বারে বারে এই যে কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ, তাও যে কতোখানি ভুয়ো তাও প্রমাণ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কেন্দ্র টাকা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে, কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এযাবৎ কেন্দ্রের থেকে প্রাপ্ত টাকার কোনো হিসেবই দিতে পারেননি। দেখা যাচ্ছে একশো দিনের কাজ হোক কিংবা আবাস যোজনা বা গ্রাম সড়ক যোজনা, যাই হোক না কেন হিসেব দিতে মমতা ব্যানার্জির সরকারের খুবই আপত্তি। এর কারণ অবশ্যই যে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি এই প্রকল্পগুলিকে ঘিরে হয়েছে, যেভাবে এইসব প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ মেলা, খেলায় খরচ করেছেন তার কোনো হিসেব দেওয়া সম্ভব নয় বলেই তিনি হিসেব দিতে এতো অনিচ্ছুক। সিএজি রিপোর্টেও এই তথ্য উঠে এসেছে। দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ এই প্রকল্পের কোনো হিসেবই এযাবৎ কেন্দ্রীয় পোর্টালে দেয়নি। এমনকী রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে আছে ভুল জমি নীতির কারণে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি।

এই লেখায় মূলত তিনটি প্রধান প্রকল্প নিয়েই আলোচনা করা হলো। তবে দুর্নীতির এখানেই শেষ নয়। এর বাইরেও একদিকে যেমন আছে ভুয়ো রেশন কার্ডের দুর্নীতি, যা তৃণমূলকে চালচোর উপাধি লাভে সাহায্য করেছে। তেমনই আছে জল জীবন মিশন যোজনা, যেখানে ফেরুল পাইপ কেনা হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ দামে। এই দুর্নীতির পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোট উপলক্ষ্যে শাসক তৃণমূলের নিরবচ্ছিন্ন সন্ত্রাস আমরা দেখেছি। আমরা দেখেছি কীভাবে নারী, শিশু, বৃদ্ধ সবাই অত্যাচারিত হয়েছেন তৃণমূলের গুন্ডাদের হাতে। অবশ্যই সেই গুন্ডামি সমাজসেবার জন্য করেনি তৃণমূল। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল পঞ্চায়েতগুলির নিয়ন্ত্রণ কবজা করে সেগুলিকে দুর্নীতির আখড়া বানিয়ে নিজেদের পুষ্টিকরণ। সেই কারণেই কোথাও দেখা যাচ্ছে তৃণমূলের যে নেতা বছরখানেক আগেও জনমজুর ছিলেন আজ তিনি চারতলা মার্বেল বসানো বাড়ির মালিক। উপতলার পিসির ভাইপো থেকে নীচের তলার দিদির ভাইয়েরা সবাই ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

আবারও পঞ্চায়েত ভোট আসন্ন। আশঙ্কা হয় সেই উপলক্ষ্যে আবারও তৃণমূলের সন্ত্রাসের নিত্যনতুন নজির দেখব আমরা। কারণ তৃণমূলের লক্ষ্যই হবে যেনতেন প্রকারেণ পঞ্চায়েতগুলিকে কবজা করে দুর্নীতর ঠেলাগাড়ির গতি অপ্রতিহত রাখা। তাই গণতন্ত্রপ্রেমী রাজ্যের হিতাকঙ্ক্ষী মানুষের উচিত আজ সর্বক্ষেত্রে তৃণমূলের বিরোধিতা করে এই দুর্নীতির শেষ করা এবং পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে গতি বজায় রাখা। □

With Best Compliments from -

A
Well Wisher

তৃণমূল জমানায় বারুদের স্তূপে পশ্চিমবঙ্গ

সঞ্জীব দে

বিগত ২০২১ ও ২০২২ এই দুটো বছর পশ্চিমবঙ্গ যেন দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। যা ৭২-৭৭-এর সেই কলঙ্কিত শাসনকালকেও হার মানায়। রাজ্যের দুষ্কৃতীরা শাসকের ছত্রছায়ায় আজ ভয় শূন্য। গত ২৫ ডিসেম্বর রাতের ঘটনা। নানুর থানার পুলিশ বীরভূম-মুর্শিদাবাদ সীমান্তে ধল্লা ব্রিজের কাছ থেকে দুই দুষ্কৃতী হাবিবুল মণ্ডল ও কাউশর শেখকে গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার করে ২টি পাইপগান, একটি অটোমেটিক পিস্তল ও ৯ রাউন্ড কার্তুজ। ঠিক তার আগের রাতে মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া গার্লস্ হাইস্কুলের মাঠ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ-সহ গ্রেপ্তার হয় এক দুষ্কৃতী। ১ জানুয়ারি রাতে শিল্পশহর দুর্গাপুরে ৫নং ওয়ার্ডের চণ্ডীদাস এলাকায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সক্রিয় কর্মী নিখিল রায়ের বাড়িতে হামলা হয়, ছোড়া হয় বোমা। অভিযোগ, বাড়িতে বোমাবাজির মতো নিকৃষ্টতম কাণ্ডটি ঘটিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী। গত দুমাসে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় একের পর এক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নাম জড়ায় শাসক দলের।

প্রকাশ্যে আসে শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দলের খবর। নভেম্বরে বীরভূমের বহড়াপুরে বোমার আঘাতে এক ব্যক্তির হাত-পা উড়ে যায়। তার কিছুদিনের মধ্যেই মেদিনীপুরের কেশপুরে বোমার ঘায়ে হাত উড়ে যায় এক তৃণমূল কর্মীর। দুটো ঘটনাতেই গোষ্ঠী কোন্দলের অভিযোগ ওঠে। আইনি শিথিলতার কারণে দুষ্কৃতী তাণ্ডবে আজ ভীত রাজ্যবাসী। দ্বিধাগ্রস্থ পুলিশ প্রশাসন আস্থা হারিয়েছে নিজেদের উপর থেকে। টালমাটাল শাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি শাসকদলের ভয়াবহ গোষ্ঠী কোন্দলের কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে তৃণমূল দলের ২৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করার অনুমতি দিল না স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। এই অঞ্চলেই এক বছর আগে যুব তৃণমূল নেতা মহরম শেখকে গুলি করে হত্যা করা হয়। অভিযোগের আঙুল ওঠে আরেক তৃণমূল নেতা রফিক মোল্লার দিকে। দুষ্কৃতীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে রাজ্যে, তারা লাগামহীন। আজ তাদের ভাবনা আরও ভয়াবহ! তারা ভাবে মন চাইলেই শ্লীলতাহানি, আর মন চাইলেই খুন করতে পারে। গত মার্চে মগরাহাটে পাওনা টাকা ফেরত দেবার টোপ দিয়ে বরুণ চক্রবর্তী ও মলয় মাখাল নামে দুই যুবককে খুন করে তাদেরই বন্ধু জানে আলম মোল্লা। জানে আলামের বিরুদ্ধে আর্থিক জালিয়াতি, জাল পণ্যের ব্যবসা-সহ একাধিক অভিযোগ আছে। জানে আলামের সঙ্গে নিষিদ্ধ সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিনের যোগ রয়েছে বলে অনুমান। বাম জমানায় সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছিল জানে আলম। বর্তমানে জানে আলামের সেজ ভাই আলমগির আলি মোল্লা মোহনপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান। দুষ্কর্মের সবেতেই নাম জড়িয়ে যায় শাসক দলের। যা ক্ষমতারই অপব্যবহার। শাসকদলের পক্ষে মোটেও তা শুভ নয়।

কথায় আছে 'পেট বড়ো বালাই'। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'ক্ষুধার্তের আবার লজ্জা কী'। রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবকেরা বড়ো অসহায়। তারা অতি সহজেই মগজধোলাই নির্ভর সস্তার রাজনীতির জালে জড়িয়ে পড়ছে। শাসকদলের তকমা সেঁটে বেকারত্বের জ্বালা ভুলে যুবকেরা মস্তানি আর বোমাবাজি করে শাসকদলের নির্বাচনী তরী পার করে দিচ্ছে। আর আমরা যেন তা দেখে দেখে অভ্যস্থ হয়ে গেছি এবং মেনে নিয়েছি। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের স্বপ্ন দেখা যুবকেরা আইনের চোখে দুষ্কৃতীর তকমা পায়! সংসার ধর্ম ছেড়ে কেউ জেলে যায়, নয়তো অকালে প্রাণ হারায়। গত ২৯ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার নওদায় সামান্য সমবায় সমিতির নির্বাচন ঘিরে অশান্তির ঘটনায় ফাটলো বোমা! চললো গুলি! এমনকী সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা ছবি তুলতে গেলে তাঁদেরও মারধর করা হয়। নির্বাচনে অশান্তি

"প্রকাশ্যে বোমাবাজি আজ প্রায় রোজের ঘটনা। ক্লাবে বোমা, স্কুলে বোমা, কলেজে বোমা, গৃহস্থের ঘরে বোমা, পরিত্যক্ত থানায় বোমা। বোমা আজ আদাড়ে-বাদাড়ে সর্বত্র!"

ও বোমা-গুলির কথা অস্বীকার করেন মুর্শিদাবাদের জেলা তৃণমূলের সাংগঠনিক চেয়ারাম্যান তথা সাংসদ আবু তাহের খান। অথচ অশান্তির প্রমাণ স্বরূপ রাস্তার উপর পড়েছিল গুলির খোল ও বোমার টুকরো। পশ্চিমবঙ্গের মাঠে-ঘাটে খেলতে গিয়ে বোমার আঘাতে শিশু মৃত্যু বা আহত হবার মতো বেদানাদায়ক ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। সম্প্রতি বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার একডালা গ্রামে মামার বাড়িতে বেড়াতে এসে বাড়ির ছাদে রাখা বোমা ফেটে আহত হয় দুই শিশু। বাড়ির ছাদে বোমা মজুত করে রাখার অপরাধে পুলিশ গ্রেপ্তার করে দাদু জামিরুল শেখকে। তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান স্বীকার করেন, 'জামিরুল তৃণমূল দলের সমর্থক। জেলার পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী স্বীকার করেন, 'মজুত বোমা থেকেই এই বিস্ফোরণ।'

গত ২২ ফেব্রুয়ারি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত যে দুটি খবর শুধু প্রশ্নই তোলে না সঙ্গে প্রমাণও করে যে পরবর্তী প্রজন্মের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই প্রধান বাধা। প্রথম খবরটি হলো, বীরভূম সদাইপুর থানার কুইটা গ্রামে মণির শেখের বাড়ির পেছনে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে জখম হয় চার শিশু— নাজমা, রুজিরা, রহিমা ও আতিয়া। অন্য ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাট পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের, নোংরা আবর্জনার থেকে বোতল কুড়োতে গেলে বোমা ফেটে নাবালক সৈয়দ শেখের ডান হাতটি উড়ে যায়। খেলতে গিয়ে ছোটোরা বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুবরণ করেছে, পশ্চিমবঙ্গে এখবর নতুন নয়। গত জানুয়ারি মাসে হালিশহরের জগন্নাথ ঘাটে বোমা বিস্ফোরণের পর রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয় দুই যুবক। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন শীতের সকালে গঙ্গাপাড়ে ক্রিকেট খেলছিল একদল যুবক। হঠাৎই বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গঙ্গার ঘাট। পুলিশের অনুমান বিস্ফোরণের বিকট শব্দের কারণে জলে পড়ে তলিয়ে গেছে দেহদুটি। প্রকাশ্যে বোমাবাজি আজ প্রায় রোজের ঘটনা। বোমা আজ রাজ্যের সর্বত্র।

ক্লাবে বোমা, স্কুলে বোমা, কলেজে বোমা, গৃহস্থের ঘরে বোমা, পরিত্যক্ত থানায় বোমা। বোমা আজ আদারে-বাদাড়ে সর্বত্র! বগটুই হত্যা কাণ্ডের পর বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের কথা উঠলেও তা আজ কথার কথাই রয়ে গেল। বছর খানেক আগের ঘটনা, স্কুলের ভেতর ক্লাস চলাকালীন এক অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রের স্কুল ব্যাগ থেকে পাওয়া যায় গুলিভরা রিভলবার। দাবানলের যে আগুন আজ দূরে আছে তা নিকটে আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা। সময় থাকতেই প্রশাসন তথা রাজ্য সরকারের কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের মুখে রাজ্য প্রশাসন 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন 'নীতি অনুসরণ করুক। নচেৎ ঘর পুড়বে সবার। বাঙ্গলার শান্তিপ্রিয় নাগরিক পরিবর্তনের আশায় বাম শাসন থেকে মুক্তি পেতেই রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। সেই পরিবর্তন বিগত বছর যাবৎ জনসাধারণকে ভয় দেখাচ্ছে, বিচলিত করছে। ঠিক যেমন গত বছর কয়েকটি ছোটো ঘটনা বিচলিত করেছিল বাঙ্গলাকে! সঙ্গে অবশ্যই নাক কাটা গেছে বাঙ্গলার সভ্য সমাজের। তার একটি হলো, ১৫ আগস্ট দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস। যখন সারা দেশ সাজো সাজো রবে প্রস্তুতি নিচ্ছে শুভদিনটিকে নতুন রূপে বরণের জন্য। সেদিন কাকভোরে পূর্ব মেদিনীপুর, খেজুরির মুরলিচক গ্রামে একদল দুষ্কৃতী এক সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধাকে গণধর্ষণ করে।

কলঙ্কিত হলো বাঙ্গলার মাটি। যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানালো। আমাদের সমাজ যে আজও দেশকে, নারীকে মাতৃরূপে পূজা করে। ধর্ষণের ঘটনার নিন্দা করে পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের কো-অর্ডিনেটর মামুদ হোসেন বলেন, 'দোষীরা অবশ্যই শাস্তি পাবে'। তার ঠিক কিছুদিন আগে উলুবেড়িয়ার বাগনানে এক বিজেপি কর্মীর বাক্‌শক্তিহীন স্ত্রীকে একা পেয়ে গণধর্ষণ করে একদল দুষ্কৃতী। গ্রেপ্তার হয় শাহিদ মল্লিক, জয়নাম মল্লিক, কুতুবউদ্দিন মোল্লা এবং তৃণমূলের যুব অঞ্চল সভাপতি দেবাশীষ রানা। অপর ঘটনাটি গত শারদীয়া উৎসবের বিজয়া দশমীর রাতের। দুর্গাপুরের ১৭নং ওয়ার্ডের অন্নপূর্ণা নগর এলাকার বাসিন্দারা দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ফিরতেই পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু সমাজ বিরোধী পুজো উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে মদ্যপানের টাকা দাবি করে, পুজো কমিটি মদ্যপানের টাকা দিতে অস্বীকার করায় শুরু হয় দুষ্কৃতী তাণ্ডব, পুজো মণ্ডপের সামনে বোমাবাজি করে, ভাঙচুর করে গাড়ি, বাড়ি, ঘর, দোকান-পাট।

সম্প্রতি অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, 'ইসলামিক জেহাদিদের হট বেডে পরিণত হয়েছে অসম'। অসম যদি জেহাদিদের হট বেড হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গ দাঁড়িয়ে আজ বারুদের স্তূপের উপর। সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের এসটিএফ শাখা একটি গাড়ি আটক করে, গাড়িটিতে পাওয়া যায় ৮১ হাজার পিস ডিটোনেটার। সেই তথ্য ধরে বীরভূমে উদ্ধার হয় ৫০০ বস্তা আমোনিয়াম নাইট্রেট। বানচাল হয় নাশকতার এক বৃহৎ ছক। ভাবা যায়! এই বিস্ফোরণে ধ্বংস হতো দেশের সম্পত্তি ও জীবনহানি হতো দেশের সাধারণ নিরীহ মানুষের। গত কয়েক মাসে ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদের ব্রিডিং গ্রাউন্ড হয়ে উঠেছে অসম। অসমের মতোই বাংলাদেশের মোস্ট ওয়ান্টেড দুষ্কৃতীদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল আজ কলকাতা। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সিআইডি খোদ কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করে বাংলাদেশের অস্ত্র কারবারি কুখ্যাত দুষ্কৃতী নূর উলতাফ নবি ওরফে তমাল চৌধুরীকে। নূর উলতাফ এরাজ্যে নাম ভাঙিয়ে, ডেরা গেড়ে গোপনে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছিল। মনে পড়ে কবি কাজী ইসলামের প্রিয় উক্তিটি, 'দুনিয়া যখন এগিয়ে চলেছে, আমরা তখনও বসে, বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজছি, কোরান-হাদিস চযে।' মাদকমুক্ত সমাজের লক্ষ্যে গণআন্দোলন চোখে পড়লেও বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, কঠোর হাতে সমাজ বিরোধী দমন বা দুস্কৃতীদের জুলুমবাজির প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত সমাজ পথে নামেনি কোনো দিনও। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সে খবর পরিবেশন করলেও সাহসিকতার অভাব হোক বা অনীহা, দীর্ঘ সময়ের চর্চাও হয়নি কোনোদিনও।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, 'সজ্জনেরা কিছুতেই একত্রিত হতে পারে না, এটাই তাদের দুর্বলতা।' □

পশ্চিমবঙ্গের ঈশানকোণে আজ অশনি সংকেত

খবরে খবর, সেরা খবর। এমন চমৎকৃত খবরে আমরা চমকে উঠি। সবার বিচার করো তুমি, এখন তোমার বিচার করবে কে? ভারতের সেরা, বিশ্বস্ত সংস্থা সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে আঙুল তুললেন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি। তিনি সিবিআই অফিসারদের সম্পত্তির হিসেবে চাইতে পারেন। প্রয়োজনে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছে টেট কেলেঙ্কারির তদন্তকারী সিবিআই অফিসারও নেতাদের মতো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। মহামান্য আদালতকে সঠিক তথ্য দান না করে বিচার ব্যবস্থার গতিপথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করছে।

তাই তিনি সিটের তদন্তকারী অফিসারকে সরিয়ে দিয়েছেন। নতুন অফিসার নিয়োগ করে বিচার প্রক্রিয়াকে দ্রুত, সঠিক পথে নিয়ে যেতে চাইছেন। সরকার স্পনসরড দুর্নীতি, সংগঠিত অপরাধ, পাহাড় প্রমাণ টেট দুর্নীতি দেখে মনে হয় আমরা এখন কোথায় বাস করছি! পশ্চিমবঙ্গের যতো জঞ্জাল কি জাস্টিস অভিজিৎ গাঙ্গুলি একা সরাবেন? ছোটো-বড়ো নেতা-সহ বুদ্ধিজীবী, নোবেল স্মারক জয়ী এখন সবাই রাজনীতির খদ্দের হয়ে গেছে। রাজনীতির পরিসর থেকে এখন কেউ বের হতে পারছে না। রাজনীতির হাত ধরে সহজে সব পেয়েছির দেশে চলে যাচ্ছেন।

এখানে নাকি পার্থিব সব সুখ মেলে। ক্ষমতার দম্ভে আজ তারা অন্ধ। লোভ, লালসা তাদের হিংস্র করে তুলেছে। তারা ন্যায়-অন্যায়ের তফাত ভুলে যায়। টেট উৎত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা পথে পথে চাকরির জন্যে হামাগুড়ি দিচ্ছে আর টেট অনুত্তীর্ণরা বহাল তবিয়তে চাকরি করছে। সরকারের ভূমিকা সদা দুর্নীতির পক্ষে। তাই সরকার ও দুর্নীতি সমার্থক হয়ে ওঠেছে। বর্তমান সরকারের অনেক মন্ত্রী, এমএলএ, এমপি আজ জেলে। অনেক নেতা-নেত্রী জেল যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। লাসভেগাসের মতো এই পাপ রাজ্যে এক অদ্ভুত নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ঈশান কোণে আজ অশনি সংকেত।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

সিন্ধু আজও মনে রেখেছে রাজা দাহিরকে

নিজের আত্মরক্ষার্থে পালিয়ে যেতে পারতেন। না, তিনি তা করেননি। হানাদার বিন কাশেমের সৈন্যদের হাতে নিহত হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিজের সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করে গেছেন সিন্ধুর স্বাধীনতা। তিনি হলেন সিন্ধুর শেষ হিন্দু রাজা দাহির সেন। সিন্ধুর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে আরও বেশি করে ঘনীভূত হলো কালো মেঘ। সেই থেকে কত বর্বরতাই না প্রত্যক্ষ করেছে ভারতবাসী। বারবার ভূলুণ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে। হিন্দুশাস্ত্রের বিকৃতি ঘটিয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে আমাদের সুপ্রাচীন সভ্যতাকে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার মুক্তিসূর্য উদিত হলেও দেশের পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডের কিছু অংশ বের হতে পারেনি অতল অন্ধকার থেকে। রাজা দাহিরের সেই সিন্ধু প্রদেশও করায়ত্ত হয় পাকিস্তানের।

তবে অবাক করা তথ্য এই যে, মরুসংস্কৃতি কবলিত সিন্ধু প্রদেশ আজও ভোলেনি রাজা দাহিরকে। সিন্ধু প্রদেশে বসবাসকারী একাংশের কাছে আজও বিন কাশেম নয়, রাজা দাহিরই নায়কের মর্যাদা পেয়ে থাকেন। তাঁরা ধিক্কার জানান মুসলমান ঐতিহাসিকদের রাজা দাহিরের চরিত্রকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টাকে। ইদানীংকালে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণ সিন্ধুর অধিবাসীদের মনে নতুন করে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাচ্ছে। চীন-পাকিস্তান ইকনমিক করিডোরের ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধুর দূরত্ব বাড়ছে। তাঁরা আঁকড়ে ধরতে চাইছেন প্রাক-ইসলামিক যুগের সভ্যতা, সংস্কৃতিকে। সম্প্রতি রাজা দাহিরের একটি মূর্তি স্থাপনের দাবি তাঁদের পাকিস্তান সরকারের বিষনজরেও এনে দিয়েছে। আসলে সত্যকে কোনোদিন মুছে ফেলা যায় না। যে কোনো কারণেই হোক না কেন, যদি সিন্ধুবাসীর মধ্যে প্রকৃত চেতনার উন্মেষ হয় এবং তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের ধর্মে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে পুনরায় ফিরে আসেন তাহলে তাঁদেরই মঙ্গল।

—**প্রতীক মুখার্জী,**
১৯/১, শিবতলা লেন, শ্রীরামপুর,
হুগলী।

ওড়িশা ‘দ্য বেস্ট কেপট সিক্রেট’

গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০২২ সংখ্যায় ‘ওড়িশা পারে অথচ আমরা পারি না’ শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে এই চিঠির অবতারণা। ওড়িশার কোনারক ও মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোতে দুটি নৃত্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যা দেখতে দেশ বিদেশ থেকে মানুষ ভিড় করে। প্রথমটি হয় ডিসেম্বরের শুরুতে আর দ্বিতীয়টি ফেব্রুয়ারির শেষে। এবার ডিসেম্বরের ১ থেকে ৫ পর্যন্ত নৃত্য উৎসবের দিন ছিল। ১ ডিসেম্বর দুপুরে কোনারকের উদ্দেশে রওনা হই। যেতে গিয়ে চন্দ্রভাগা বিচের কাছে সাজানো গেট ও লোকজনের ভিড় দেখে খবর নিয়ে জানি, বিকেল ৪টায় আন্তর্জাতিক স্যান্ড আর্ট ফেস্টিভালের বা বালু শিল্পকাজ উৎসবের উদ্‌বোধন হবে।

উৎসব উদ্‌বোধন করলেন রাজ্যের সংস্কৃতি মন্ত্রী। ঠিক ১ মিনিটের ভাষণ। প্রবেশ দ্বার খুলে দেওয়া হলো। ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। সমুদ্রকে পিছনে রেখে ৩৫টি ব্লক করা হয়েছে, দুজন করে জুটি এক একটি ব্লকে একজন সাহায্যকারীর সহায়তায় বালির মূর্তি বানাচ্ছে। ১৫ মিনিট আগে থিম বলে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দিনের থিম ছিল খেলাধুলা। শুনলাম তিন ঘণ্টা সময়, অর্থাৎ সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত তারা মূর্তি বানাবে, এরপর বিচারকের দল এসে বিচার করবেন এবং প্রথম তিনটি স্থান পাওয়া শিল্পকাজের নীচে তা উল্লিখিত হবে। প্রত্যেকদিন পরিবর্তিত থিম ঘোষণা হবে ১৫ মিনিট আগে এবং এই ভাবে

বিচারপর্ব চলবে। শেষদিন পুরস্কার দেওয়া হবে। সমুদ্রের সামনে কী অসাধারণ পরিবেশ ও অসাধারণ সব শিল্পকলা। দ্বিতীয় দিনের বিষয় ছিল women empowerment, ইত্যাদি। মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় সেইসব শিল্পকাজ দেখে। এরপর ৫টা নাগাদ নৃত্য উৎসবের দিকে রওনা হলাম। দেখলাম রাস্তার ডানদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে একটি মেলা শুরু হয়েছে। এই তিনটি বিষয়, অর্থাৎ নৃত্য, বালি শিল্প ও মেলা, এই নিয়ে ৫ দিন ব্যাপী কোনারক উৎসব।

বিকেল ৫.৩০ মিনিটের মধ্যে আমরা নৃত্য উৎসবের অনুষ্ঠানস্থলে চলে যাই টিকিট পাবার জন্য। ওখানে গিয়ে পারিপার্শ্বিক আলোকসজ্জা দেখে অবাক হয়ে যাই। অনুষ্ঠান স্থলের ভিতরে ও বাইরে, প্রত্যেক বাড়ি ও গাছ আলো দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাজানো। মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে টিকিট কাউন্টারে গিয়ে ৫ দিনের সিজন টিকিট কাটলাম। ৫.৩০ মিনিটে প্রবেশ গেট খুলে দিল। কয়েক পা এগিয়ে থামতে হলো সিকিউরিটি চেকের জন্য। ওটা হবার পর এগিয়েই দেখি দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটি পাত্র হাতে নিয়ে দর্শকদের বরণ করার জন্য। একজনের পাত্রে আছে ফুলের পাপড়ি, আর একজনের চন্দন। তাই দিয়ে বরণ হবার পর আমরা এগোলাম নৃত্য মঞ্চের দিকে। স্টেডিয়ামের মতো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গ্যালারির মতো জায়গায়, যেখানে গ্যালারির প্রত্যেক ধাপে চেয়ার পাতা। ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত বিশাল বড়ো ও চওড়া ধাপগুলিতে অসংখ্য চেয়ার। নীচের একটি সারি ছিল সোফা, তোয়ালে দিয়ে ঢাকা, ভিআইপিদের জন্য। সামনে বিশাল বড়ো মঞ্চ ডানদিকে প্রভু জগন্নাথদেব সঙ্গীদের নিয়ে অবস্থান, আলোতে ঝকমক করা মূর্তি। পিছনে আলোকোজ্জ্বল সূর্য মন্দির। আলো ঝলমলে গোটা পরিবেশটাই অসাধারণ।

অপেক্ষা করছি নাচ শুরুর জন্য। মঞ্চের বামদিকে গায়ক ও বাদকের দল প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক ৬.৩০ মিনিটে ঘোষণা শুরু হলো। প্রভু জগন্নাথদেবকে ফুল নিবেদন ও প্রণামের পর মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের ঠিক ২ মিনিটের স্বাগত ভাষণ অনলাইনে শোনানো হলো। তারপরই প্রথম নাচের বিষয়বস্তু বলে দিয়ে নাচ শুরু হলো। প্রথম নাচ ছিল মালয়েশিয়া থেকো আসা দলের রামায়ণ অবলম্বনে ওড়িসি নাচ। কী অসাধারণ নাচ, সঙ্গে আলো, পোশাক, গান ও বাজনা। সূর্য মন্দিরের সামনে কী অসাধারণ উপস্থাপনা। প্রথম নাচের পরই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীদের পরিচয় ও সংবর্ধনা এবং তারপরই দ্বিতীয় নাচের প্রস্তুতি। কোনো ভিআইপি কালচার নেই, স্টেজে বাড়তি একজনও নেই, যিনি উঠছেন জুতো খুলছেন, আর কারোর অনুপ্রেরণাও নেই। সব মিলিয়ে কী যে অসাধারণ পরিবেশ, সঙ্গে কী নিখুঁত ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা। প্রতিদিন এইভাবে দুটি ভাগে দুটি দলের বিভিন্ন ঘরানার ও বিষয়বস্তুর ধ্রুপদী নাচের আসর এক অদ্ভুত উন্মাদনা সৃষ্টি করত যা আজও মনকে শিহরিত করে। প্রতিদিন খাতা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবীরা ঘুরে ঘুরে দর্শকদের মতামত নিত। কী আশ্চর্য, তৃতীয় দিনে দেওয়া আমার দুটি পরামর্শ দেখি পরের দিন গৃহীত ও কার্যকর হয়েছে। একটি ছিল সিজন টিকিটধারীদের বসাতে একটু অগ্রাধিকার দেওয়া এবং নৃত্য রূপ ও শিল্পীদের পরিচয়ে ওড়িয়ার বদলে একটু বেশি ইংরেজি ব্যবহার করা। এতটা আশা করিনি। প্রতিদিন নাচ দেখে ফেরার সময় বালুশিল্পীদের কাজ দেখতে যেতাম।

৫ দিন পর ফেরার সময় বারবার মনে হচ্ছিল আমাদের রাজ্যের সঙ্গে কত তফাত, এখানে স্টেজে কত লোক, কে কতো বড়ো নেতা দেখানো, মাইক ধরে আর না ছাড়া, কাউকে বলতে না দিলে রাগারাগি, কী জঘন্য ভাষণ, আর বারবার অনুপ্রেরণার উল্লেখ করা ইত্যাদি। দুটি পাশাপাশি রাজ্যের শিল্প আর কর্ম সংস্কৃতির কত তফাত। এখন ওড়িশাকে বলা হচ্ছে the best kept secret সত্যিই তাই। অন্তত আমাদের ৫ দিনের সফরে দুটি আন্তর্জাতিক উৎসবের ব্যবস্থাপনা দেখে ও মেলা ঘুরে এবং সামগ্রিকভাবে কোনারকের উৎসব দেখে আমরা এটি মানতে বাধ্য হয়েছি। নিখুঁত এইরকম অনুষ্ঠান আয়োজনের সঙ্গে আমরা তো এখন আর পরিচিত নই। আমরা বেশিমাত্রায় রাজনীতি সচেতন বলে বেশি মাত্রায় সংস্কৃতি বিহীন!

—ড. বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়,
কলকাতা।

বন্দরের নাম বিশাখাপত্তনম

মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে দুটি কথা জেনে নেওয়া জরুরি। প্রথমত ‘উপসাগর’ এবং দ্বিতীয়ত, ‘উপদ্বীপ’ প্রসঙ্গে। যে সাগরের তিনদিক স্থল দিয়ে ঘেরা থাকে এবং একদিকে খোলা থাকে তাকে ‘উপসাগর’ বলে। যেমন আমাদের বঙ্গোপসাগর অর্থাৎ বঙ্গ উপসাগর। এই উপসাগর পশ্চিমে ভারত, পূর্বে ব্রহ্মদেশ এবং উত্তরে গঙ্গা বদ্বীপ অর্থাৎ তিন দিক স্থল দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণটা ভারত মহাসাগরের দিকে খোলা। যে ভূভাগ চারিদিক জল দিয়ে ঘেরা থাকে তাকে দ্বীপ বলে। আবার যে ভূভাগ তিনদিক জল দিয়ে ঘেরা থাকে এবং এক ভাগ মূল ভূভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে উপদ্বীপ বলে। যেমন, দক্ষিণ ভারত উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপ বঙ্গোপসাগর, আবর সাগর ও ভারত মহাসাগর দিয়ে তিনদিকে ঘেরা এবং উত্তর দিক মূল ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

মূল বিষয়ে ফিরে আসি। অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য ৯৬০ কিলোমিটার। দক্ষিণে বঙ্কোপসাগরের উপকূল রেখায় অবস্থান করে আছে বিশাখাপত্তনমের মতো নামকরা বড়ো বন্দর। উল্লেখ্য, পত্তনম শব্দের অর্থ বন্দর এবং বিশাখা শব্দের অর্থ বিভক্ত শাখা। প্রাকৃতিক বন্দরটি এক ছোটো উপসাগরে অবস্থান করছে। এই উপসাগরের উত্তরে ও দক্ষিণে রয়েছে দুটি ছোটো উপদ্বীপ। পশ্চিমে রয়েছে তটভূমি। পূর্বে রয়েছে খোলা যা বঙ্গোপসাগরে চলে গেছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বন্দর ও নগর দশ মিটার উচ্চতায় অবস্থান করছে। উল্লেখ্য, পশ্চিম থেকে নগরের এক ছোটো নদী ছোটো উপসাগরে মিলেছে। দুই উপদ্বীপ ও তটভূমি বেষ্টিত উপসাগরে বড়ো বড়ো জাহাজ যাতায়াত করত। এই ছোটো উপসাগরের তটরেখা বা উপসাগরকে ছোটো নদী দুই অংশে বা দুই শাখায় বিভক্ত করে রেখেছে। এরূপ শাখায় বিভক্ত করাকে বিশাখা বলে। বিশাখায় অবস্থিত বন্দরের নাম হয় বিশাখাপত্তনম। প্রসঙ্গত, বিশাখা নক্ষত্রের কথা বলতে হয়। বিশাখা নক্ষত্রের আকৃতিকে তোরণ বা প্রবেশদ্বারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বিশাখাপত্তনম নামটি সব শর্ত পূরণ করছে।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

জলের অপচয় রোধে মহিলাদের ভূমিকা

অপরূপা সেন

গোটা বিশ্বেই আজ পানীয় জলের জন্য হাহাকার বাড়ছে। আমাদের দেশেই রাজস্থানে শুখা মরসুমে একটু জলের জন্য মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হয় মহিলাদের। গরমের সময় দেশের অনেক রাজ্যেই কম-বেশি জলের সঙ্কট দেখা দেয়। আমরা যদি প্রতিদিনের ব্যবহারে জল খরচে একটু নিয়ন্ত্রণ আনতে পারি তাহলে জলের সমস্যা অনেকটাই মেটানো সম্ভব হবে।

আমাদের বেশিরভাগ জল নষ্ট হয় রান্নাঘরে। সেই দিকটা কিন্তু আমরা এড়িয়ে যাই। অনেক সময় আমরা টেরই পাই না যে কীভাবে জল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জলের জোগান অপর্যাপ্ত থাকায় আমরা এই জল বাঁচানোর বিশেষ একটা চেষ্টা করি না।। বাসন ধোয়ার সময় আমরা রান্নাঘরের সিঙ্কে কল চালিয়ে দিলাম। কল চালিয়ে অন্য কাজে মন দিলাম। আমরা যদি সেসময় একটু সতর্ক হই তাহলে জলের অপচয় কিছুটা হলেও কম হয়।

সাবান দিয়ে আপনি যখন বাসন মাজছেন তখন কলটা মনে করে বন্ধ করে দিন। কারণ এই সময়ে আপনার কল খুলে রাখার আদৌ কোনো প্রয়োজন নাই। কলের মুখটা এই সময় ভালো করে বন্ধ করে দিন। একটুও জলের অপচয় যেন না হয়। সাবান দিয়ে সব বাসন মেজে নেওয়ার পর কল চালিয়ে বাসনগুলো ধুয়ে ফেলুন। এতে আপনার জল বাঁচবে। তাতে জলের সঞ্চয় বাড়বে। পাম্পের মাধ্যমে বারবার জল তোলার প্রয়োজন পড়বে না।

ওয়াটার পিউরিফায়ার কিন্তু জল অপচয়ের একটা বড়ো কারণ। শুনে অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়! কিন্তু এটাই সত্যি। কম লোকেই জানে যে, পিউরিফায়ারের ট্যাংককে এক লিটার জল জমা করতে তিন লিটার জল নষ্ট করতে হয়। তাই বলে কি পিউরিফায়ার ব্যবহার করবেন না? তা নয়। স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে তো পিউরিফায়ার ব্যবহার করতেই হবে। স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনো আপোশ করা যায় না। পরিশ্রুত জলই পান করতে হবে। কিন্তু পিউরিফায়ারে যে জলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই বাড়তি জলটা অন্য কোথাও ধরে রাখুন। আর সেটা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করুন। এই বাড়তি জলকে আপনি অনেক কাজে ব্যবহার করতে পারেন। যেমন ধরুন, ওয়াশিং মেশিনে কাপড় কাচতেও আপনার অনেকটা জলের প্রয়োজন হয়। এই বাড়তি জল সেই কাজে ব্যবহার করুন। আবার ধরুন, আপনার যদি গাড়ি থাকে, সেই গাড়ি ধোওয়ার কাজেও বাড়তি জল অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন।

আবার যে জলে আপনি শাকসবজি ধুয়ে নেন সেই জলকেও অন্য কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। শাকসবজি ধোওয়া জল কোনো একটা বড়ো পাত্রে ভর্তি করে নিন। এবার সেই জল বাড়িতে যে ফুলের টব রয়েছে তাতে দিতে পারেন। কারণ বাড়ির গাছের পরিচর্যার জন্যও প্রতিদিন অনেক জলের প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে এই জল। আলাদা করে আপনারে আর কলের জল ব্যবহার করতে হবে না।

ডিমসেদ্ধ আমাদের প্রায় সকলেরই একটা প্রিয় খাবার। সেই ডিম সেদ্ধ করতে বেশ কিছুটা জলের প্রয়োজন পড়ে। জলটা ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই জল বাঁচানোর একটা সহজ উপায় রয়েছে। ডিম সেদ্ধ করতে ইলেক্ট্রিক বয়লার ব্যবহার করুন। সেদ্ধও হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। এতে সময়ও কিছুটা সাশ্রয় হবে।

জল সাশ্রয়ের আরও একটা সহজ উপায় রয়েছে। আমরা সাধারণভাবে কাউকে জল দেওয়ার সময় গ্লাস ভর্তি করে জল দিই। কিন্তু খুব তেষ্টা না পেলে কেউ সব জলটা পান করেন না। ফলে কিছুটা পান করে বাকিটা ফেলে দেন। এতে জলের অপচয় হয়। অতিথিকে অর্ধেক গ্লাস জল দেওয়া অভ্যাস করুন। তাতে যদি তার তেষ্টা না মেটে তিনি চেয়ে নিতে পারবেন। এতে জলের অনেক সাশ্রয় হবে।

যে কোনো কিছু রান্না করার সময় প্রয়োজন অনুযায়ী জল দিন। প্রথমেই অতিরিক্ত জল দিয়ে পরে তা নষ্ট করবেন না। এতেও জল কিছুটা হলেও বাঁচাতে পারবেন।

এগুলি খুব সাধারণ বিষয় হলেও একটু মনে করে দেখবেন আমরা প্রতিদিন নানাভাবে জলের অপচয় করি। গৃহিণীরা একটু মনোযোগী হলেই জলের অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। □

'অঙ্গনা' বিভাগের জন্য লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
বিষয় : নারী ক্ষমতায়ন, বর্তমান ভারতে নারী সমাজের অগ্রগতি, দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী মাতৃশক্তি, নারী শক্তির উত্তরণের কাহিনি, রত্নগর্ভা মা ইত্যাদি নারী জাগরণের যে কোনও দিক। যা ভারতীয় নারী সমাজের কাছে ইতিবাচক বার্তা দিতে সক্ষম।
ওয়ার্ড ফাইল অথবা পিডিএফ পাঠাতে পারেন। হাতে লেখা কপি স্ক্যান করে পাঠাবেন।
যোগাযোগ ঃ স্বস্তিকা সম্পাদকীয় বিভাগ, মোবাইল-৮৪২০২৪০৫৮৪

বিঃ দ্রঃ- অঙ্গনা বিভাগে শুধুমাত্র মহিলা লেখকদেরই লেখা প্রকাশিত হয়।

মধুবৃক্ষের মধুরসের ইতিকথা

মাধবী মুখার্জী

আমাদের এই মাতৃভূমি ভারতের ঐশ্বর্য ও সম্পদ অনন্য। সভ্যতার ইতিহাসে সুমিষ্ট মধুবৃক্ষের বর্ণনা রয়েছে। এই রস, গুণ, গন্ধ ও স্বাদ অতুলনীয়। ভারতীয় উপমহাদেশে আখ, তাল ও খেজুর গাছের মধুরস থেকেই তৈরি হয় গুড়।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে দক্ষিণ ভারতের তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রথম এই রসের গুড় তৈরি শুরু হয়েছিল। আখ, খেজুর ও তালের গুড় স্বাদে, গন্ধে ও গুণে সেরার সেরা।

এই গুড় যতদিন আমাদের খাদ্য তালিকাতে গুরুত্ব পেয়েছে ততদিন মানুষ সুসাস্থ্যের অধিকারী ছিল। চিনির প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্যের অবনতি হতে শুরু করে। কেন না চিনিতে ফ্রুক্টোজ শর্করার পরিমাণ কম এবং গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি মাত্রায় থাকে।

চিনি জিভে দেওয়ার অল্প সময় পর গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়ে রক্তে মিশে যায়। খাদ্য তালিকাতে ভাত অবশ্যই থাকে এবং সেই ভাতের থেকেও গ্লুকোজ আমাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করে। আমাদের শরীরে গ্লুকোজের আধিক্য শরীরে নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়।

তাল ও খেজুর গুড়ে ফ্রুক্টোজ ফাইবার প্রচুর পরিমাণে থাকে। প্রতিদিন যদি একটু করে গুড় খাওয়া যায় তাহলে হজম শক্তি বাড়ে। গুড় আমাদের হজমে সাহায্যকারী এনজাইমের শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। এখানে বলা যেতে পারে চিনির চেয়ে গুড়ের ক্যালরি কম।

গুড়ের খাদ্যগুণ জানলে সত্যিই অবাক হতে হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে মিনারেল, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, সেলেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও জিঙ্ক থাকে।

গুড়ে থাকা আয়রন শরীরে রক্ত তৈরি করে, রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে তোলে। তার ফলে রেসপিরেটরি সিস্টেম অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। শরীরকে বিষমুক্ত করতে গুড়ে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট কাজে লাগে। এটি অ্যান্টি অ্যালার্জি হিসেবেও দারুণ কার্যকারী। গুড়ে থাকা জিঙ্ক ও সেলিনিয়াম

ইমিউনিটি সিস্টেমকে মজবুত করে। গুড় শরীরে তাপমাত্রা উৎপাদন করে এবং সেটা ধরে রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এতে পুষ্টি উপাদানের পাশাপাশি আছে আয়রন, ফসফরাস, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন বি এবং সি। গুড় জ্বর, সর্দি-কাশি প্রতিরোধ করে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। শ্বাসনালি, খাদ্যনালি, পাকস্থলী, অন্ত্র ও ফুসফুসে অবাঞ্ছিত রোগের আক্রমণ প্রতিহত করে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। রক্তনালি প্রসারিত করে, রক্তের প্রবাহ স্বাভাবিক রাখে। পাশাপাশি হিমোগ্লোবিনের মাত্রাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে। এটি ভিটামিন সি ও মিনারেলের উৎস, অকৃত্রিম মিষ্টির ভাণ্ডার। শরীরে গুড়ের মিষ্টত্ব কখনই মধুমেহ বা ব্লাড সুগার লেভেল বাড়িয়ে তোলে না।

তাল ও খেজুর গুড় তৈরির প্রণালী যথেষ্ট আকর্ষণীয়। পরিষ্কার মাটির পাত্র জীবাণুমুক্ত করে চুনের প্রলেপ দিয়ে সেই পাত্রে তাজা রস সংগ্রহ করা হয় তারপর সেই রসকে লোহার কড়াইতে ফুটিয়ে PH (অম্লত্ব) মেপে দেখতে হয় PH 7.5 অর্থাৎ অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের সমতা। যদি রসে অম্লত্বের পরিমাণ বেশি থাকে গুড় ভালো হয় না। ☐

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে

হীরক কর

দৃশ্য-১

অল্প কুয়াশায় আচ্ছন্ন বরফ রঙা জল। সূর্য ওঠার ঢের দেরি। সাগরমেলার চার নম্বর ঘাটে একজন সাগরসঙ্গমে ডুব দিচ্ছেন আর উঠছেন। আর চোখ মুছছেন। অশ্রু না স্নানের জল অস্পষ্ট অন্ধকারে ঠাওর হয় না। যদিও ভেপারের সোনালি আলোয় ভেসে যাচ্ছে সাগরতট। সাদা কুয়াশার ঘেরাটোপ ভেঙে ক্রমশ লাল হতে থাকে পূর্ব আকাশ। ছায়া পড়তে থাকে জলের উপরে। তারপরে আকাশে সদ্য বিবাহিতার লাল টিপ। জলে লালের দীর্ঘ রেখা। মকর সংক্রান্তির প্রথম আলো।

সূর্য প্রণাম সেরে তিনি উঠে এলেন। কাছে যেতে দেখি হাউ হাউ করে কাঁদছেন প্রৌঢ়। অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে মুখমণ্ডল জুড়ে। নাম তাঁর পবন সিংহ। বিহারের ছাপড়া জেলার বাসিন্দা। কিন্তু কাঁদছেন কেন? জানা গেল, পারিবারিক জমি নিয়ে বচসার জেরে আচমকাই পবন সিংহের হাতে খুন হয়ে যান তাঁর ভাই উধম সিংহ। ২০০২ সালের ঘটনা। তাকে ১২ বছর সাজার কথা শুনিয়ে ছিলেন ছাপড়ার জেলা

জজ। ২০০৩-এ তার জেলবাস শুরু। ভালো আচার-আচরণের দরুন ২০১৩ সালেই ছাড়া পেয়ে যান। কিন্তু খুনের অনুতাপ তাকে কুরে কুরে খায়। অনুতপ্ত তিনি। তাই ফি বছর মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে আসেন পবন সিংহ। গঙ্গার জলে স্নান করে পাপস্খলন করতে চান তিনি। সাধারণ ভারতবাসীর বিশ্বাস, মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে সঙ্গমের জলে ডুব দিলে জীবনের সব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সূর্য তখন অনেক রক্তিম। ভাবি, এই হচ্ছে আসল ভারত।

দৃশ্য-২

কপিল মুনির মন্দিরের পিছন। চলেছি আধ্যাত্মিক ভারতের খোঁজে। অনুসন্ধিৎসু মন কোনও মহাত্মার সান্নিধ্য চায়। নাগা সন্ন্যাসীদের সারি সারি হোগলার ঘর। ভিন্ন ভিন্ন তাদের আখড়া। সাগরে তারা এক। আধুনিক ভারতের সাধু মোবাইলে কথা বলেন।

সিনেমা দেখেন। আমি বলি এ কেমন সাধু তোমরা? হাত পেতে টাকা চাও। তাড়া করে তারা। তারই মধ্যে চোখে পড়ে এক গোরা সাধ্বীর ডেরা। গেরুয়া বসনে, মাথায় জটার খোঁপায় ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসিনী নাগা সাধুদের ভিড়ে বেমানান। খটকা লাগে, আমি যে মহাত্মাকে খুঁজছি, ইনিই কি তিনি? এগিয়ে যাই। আমার উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ খোলেন। রাশভারী মানুষটি শুরুতে কথা বলতে চাননি। হিন্দিতে একথা সেকথার পর সোজাসুজি বাংলায় আমার নাম জিজ্ঞেস করে বসলেন। চমকে উঠলাম। জানা গেল, তিনি ত্রিপুরার বাঙ্গালি। পূর্বাশ্রমের নাম, দীপালি রায়বর্মন। ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। পেনশনের টাকায় জীবন চলে। মাধুকরীর পাত্র গঙ্গাসাগরের কুটিরে থাকলেও তিনি ভিক্ষা চান না। কুটির বেঁধেছেন তারকেশ্বরে। প্রতি বছর গঙ্গাসাগরে আসেন। এবছর গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হলে তাঁর ত্রিপুরা যাবার কথা। ত্রিপুরা সরকারের কাছে বর্ধিত পেনশনের বিষয়ে দরবার করতে। জানতে চাইবেন কেন মিলছে না তাঁর প্রাপ্য পেনশন। সন্ন্যাস জীবনে তাঁর নাম দেবজ্যোতি। সন্ন্যাসিনী দেবজ্যোতির কথায়, ছোটোবেলা থেকে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর গভীর টান। চাকরি পাওয়ার পর রামকৃষ্ণ মিশনের বীরেশ্বর মহারাজ তাঁকে দীক্ষা দেন। মা সারদার বিশেষ স্নেহধন্য বীরেশ্বর মহারাজ। কিন্তু দীপালির জীবন বদলে দিলেন বীশ্বেশ্বর গিরি। তিনি দেবজ্যোতির সাধন জীবনের মাস্টারমশাই।

সন্ন্যাসিনী জানান, আজও হিমালয়ের জ্ঞানগঞ্জ থেকে সাধকরা গঙ্গাসাগরে আসেন। আকাশচারী হয়ে সূক্ষ্ম শরীরে। এক ঝলক সুবাতাসের মতো তাঁরা। সাগর সৈকতে বিচরণের সময় কোনো কোনো ভাগ্যবান তাঁদের ছায়া দর্শন করার সুযোগ পান। কোন রূপে কখন ওঁরা এসে কৃপা করেন কেউ বুঝতে পারেন না। তাঁরা মন পড়েন। কে মনে মনে কী ভাবছে নজর রাখেন। এখন হয়তো গঙ্গাসাগরে অদৃশ্যমান মহাত্মাদের নজরে তুমি, আমি, আমরা সবাই। সাগর যতদিন এই কপিলমুনির মন্দির রেখে দেবে, ডুবিয়ে, ভাসিয়ে নিয়ে না যাবে, ততদিন তাঁরা আসবেন। তাঁদের খুঁজতে আমরা আসব।

মন বলে, এক উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক এখন সন্ন্যাসিনী, এ কীসের ইঙ্গিত। এই হলো আধ্যাত্মিক ভারত।

দৃশ্য-৩

মকরসংক্রান্তির সকাল। দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু ১ নম্বর ঘাটে স্নান করতে নেমেছেন। খবরটা কয়েকজন সরকারি আধিকারিক আর সাংবাদিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হঠাৎ পিল পিল করে ১ নম্বর ঘাটে সাধুর দল ছুটে আসতে থাকল। নিমেষে পঞ্চাশ-ষাট জন সাধুর জমায়েত হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, মোবাইলে মোবাইলে খবর ছড়িয়ে তারা সমবেত হয়েছেন। কিন্তু কেন? বোঝা গেল সুজিত বসু জল থেকে উঠে আসতেই। সাধুর দল বলতে থাকে, 'অনাচার, ভ্রষ্টাচার, বহোত হুয়া, আভি তো কুছ ছোড়ো...।' তাদের দাবি, সব সাধুকে ১০০ টাকা করে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের হস্তক্ষেপে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন মন্ত্রীমশাই। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তাঁরাও কিন্তু জগৎ সংসারের খবর রাখেন। এও এক ভারত।

গঙ্গাসাগর মেলা কারও কাছে এখনও কৃচ্ছ্র সাধনের জায়গা। কারও কাছে আবার মহোৎসব। সাগরমেলার সময় কী কারণে যেন সূর্য দেবতার ঘুম ভাঙে না। ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায়। দৃশ্যমান্যতা হ্রাস পায়। তাতে শীত আরও জাঁকিয়ে পড়ে। শীত তার দাঁত বের করলে তীর্থযাত্রীদের কষ্ট বাড়ে। মধ্যরাতে সাগরমেলার পথে-প্রান্তরে একখানি কম্বল সম্বল করে গা মোড়া দিয়ে শুয়ে থাকেন মানুষ। সরকারি আধিকারিকরা তাদের ছাউনির তলায় যেতে বললে তারা যেতে চান না। বলেন, কষ্ট করতেই তো এসেছি। একটু ভোর হলে সঙ্গমে ডুব দিয়ে ছোটেন কপিলমুনির মন্দিরে। পুজো দিতে। হয়তো কষ্ট পাওয়াটাই তীর্থের নিয়ম। কষ্ট না করলে পুণ্য হয় না, এই কথাটা এদেশের তীর্থযাত্রীদের মনে গেঁথে গেছে।

সাগরমেলার পুণ্যার্থীদের মধ্যে সে ধারণা আরও গাঢ়।

পাশাপাশি চলে মহোৎসব। কোটি কোটি সরকারি টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু কোনো হিসাব নেই। বাজেট কত? সরকারি আধিকারিক থেকে মন্ত্রী কেউই বলতে পারেন না। বলেন, বিভিন্ন দপ্তর কাজ করছে। একেক দপ্তরের একেক রকম খরচ। কী করে বাজেট বলা যাবে। হাঁ, ঠিকই ১৯৮৪ সালে জ্যোতি বসু সাগরমেলা রাজ্য সরকারের হাতে নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর অর্থাৎ পিএইচই-কে মেলা সংগঠনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পিএইচই ছাড়াও মেলার সঙ্গে যুক্ত পরিবহণ, বিদ্যুৎ, সুন্দরবন উন্নয়ন, দমকল, তথ্য-সংস্কৃতি, তথ্য-প্রযুক্তি, স্বরাষ্ট্র, সিভিল ডিফেন্স দপ্তর। প্রত্যেকটি দপ্তরের বাজেট আলাদা। আলাদা আলাদা খরচ। আর সব খরচেরই বরাদ্দ করে অর্থ দপ্তর। অর্থাৎ মেলার মোট বাজেট বরাদ্দ বলা সম্ভব। যদিও সরকারি আধিকারিক থেকে মন্ত্রী সকলেই বিষয়টা এড়িয়ে গেছেন। বিদ্যুৎমন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস অনেক কষ্টে বলেছেন, দেড়শো কোটি টাকা। কিন্তু সূত্রের খবর শেষ পর্যন্ত ওই খরচ দাঁড়াবে ৭০০ কোটি টাকায়।

হবেই-বা না কেন। মেলায় সকলেই ভিআইপি। কপিলমুনির মন্দিরের সামনে সব সময় লালবাতি, নীলবাতির গাড়ির ভিড়। সব সময় যানজট। যার কোনো কাজ নেই, তিনিও নীলবাতির গাড়ি চড়ে বউ-বাচ্চা নিয়ে হাজির। মন্দিরে ভিতরে ভিআইপিদেরও ভিড়। সেখানে কে ছোটো ভিআইপি, কে বড়ো ভিআইপি পরিমাপ করা হয়। মেলার 'হার্টলাইন' ২ নম্বর রাস্তা, যেখানে দমকল আর অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া কোনো গাড়ি যাবার কথা নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ হেঁটে চলেছেন, সেখানে মানুষকে প্রায় চাকায় মাড়িয়ে

বঙ্গের পাঁচ তীর্থ

হীরক কর

এ যেন মিনি ভারতবর্ষ। গঙ্গাসাগর। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, দেশের সব প্রান্তের মানুষ এখানে আসেন পাপমোচনের আকাঙ্ক্ষায়। শুধু কপিলমুনির মন্দির নয়, এ রাজ্যের আরও অনেক তীর্থক্ষেত্রের আকর্ষণ রয়েছে ভিন রাজ্যের বাসিন্দাদের মনে। সাগর থেকে ফেরার পথে তাঁরা

ছুঁয়ে যান নিদান পক্ষে কালীঘাট আর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। এবারে তাই সাগরমেলার মূল আকর্ষণ ছিল পাঁচ শক্তিপীঠের মডেল। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, তারকেশ্বর ও মালদার জহুরা কালীমন্দিরের অবিকল রূপ উঠে আসে সাগরমেলা প্রাঙ্গণে। মহাদেবের ডুগডুগির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সেখানে। নাম, 'বাংলার মন্দির'। এই অভিনব ভাবনা রূপায়ণ করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেলার চার নম্বর রাস্তায় একটা এলাকা চিহ্নিত করা হয়। তিন মাস আগে থেকেই শুরু হয় মন্দির তৈরির কাজ। মেলা শুরুর আগে প্রস্তুত হয়ে যায় পাঁচ মন্দির। কাঠ, বাঁশ, প্লাইউড, থার্মোকল দিয়ে তৈরি হয় এই মন্দির প্রতিরূপ। নদীয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে বাছাই করা ৬০ জন শিল্পী দিনরাত এক করে ফুটিয়ে তোলেন এই অভিনব শিল্পকলা। শিল্পীরা বিভিন্ন আর্ট কলেজের পড়ুয়া অথবা প্রাক্তনী। মন্দিরগুলো আধুনিক এলইডি আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়। ত্রিমাত্রিক মাধ্যমে এমন ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় যে দর্শক মনে করেন তিনি আসল মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছেন। এছাড়া অনলাইনে আসল তীর্থক্ষেত্র থেকে সরাসরি পুজো দেখানোর ব্যবস্থা ছিল এখানে। বাংলার মন্দির প্রাঙ্গণে বসানো হয় ৩টি এলইডি বোর্ড ও ৪টি ভ্রাম্যমাণ এলইডি পর্দা। যাতে পাঁচটি মহাতীর্থের লাইভ পূজা লক্ষ লক্ষ মানুষ দর্শন করেন। কথা হচ্ছিল জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার সঙ্গে। বলছিলেন, 'বাংলার জাগ্রত পীঠস্থানগুলোর অন্যতম পাঁচটি মন্দিরকে আমরা এবারের সাগরমেলায় তুলে ধরেছি। পুণ্যার্থীদের কথা ভেবেই এই ব্যবস্থা। কেননা, দূরদূরান্ত থেকে আসা অনেকেরই এ রাজ্যের মন্দিরগুলো দেখার আকাঙ্ক্ষা থাকে। কিন্তু অনেকেই সময়াভাবে যেতে পারেন না। তাই, আমরা চেষ্টা করেছি মডেলের মাধ্যমে এই মন্দিরগুলো অবিকল ভাবে ফুটিয়ে তুলতে'।

এই পাঁচ মন্দিরে ছিল পুজো দেবার ব্যবস্থা। ছিলেন পুরোহিত। ছিল ডালার উপকরণ। কিন্তু ভিড়ের চাপে মেলার চতুর্থদিনের মাথায় সেই পুরোহিত উধাও হয়ে যান। পরের পর অস্বাভাবিক পুজোর চাপ আর তিনি সামলাতে পারছিলেন না। যদিও এই মন্দিরপুঞ্জ স্থায়ীভাবে রাখার জন্য চিন্তা ভাবনা করছে জেলা প্রশাসন। স্থানীয়দেরও দাবি তাই। সব মিলিয়ে এবারের গঙ্গাসাগর মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল পশ্চিমবঙ্গের ৫ মন্দির দর্শন। ■

অনবরত ছুটে চলেছে মন্ত্রীদের নীলবাতির কনভয়।

তারই মধ্যে সেই পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে সাইকেল চালিয়ে গঙ্গাসাগরে এসে করোনা ভাইরাস সেজে ঘুরে বেড়ালেন একজন। আর ছোট্ট মেয়ে আসমা খাতুন। সাগরতলে মুসলমান কন্যার হাতের চুম্বকে গেঁথে যায় হিন্দু পুণ্যার্থীদের দানের খুচরো পয়সা। সে পয়সার বিনিময়ে চাল আসে তার ঘরে। নিজের হাতে ভাইকে মেরে ফেলা পবন সিংহ কি মুক্তি পেলেন অনুশোচনার আগুন থেকে? সন্ন্যাসিনী দীপালি কি পেলেন তার বর্ধিত পেনশন? যে অর্থ কাজে লাগবে আর্তের সেবায়। জানি না। জানা হবে কিনা তাও জানা নেই।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আটজন মন্ত্রীকে মেলা তদারকির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অথচ, সরকারি সিস্টেমে মেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে জেলাশাসক ছাড়া উপায় নেই। মন্ত্রীরা শুধু বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফোটো সেশানে ব্যস্ত ছিলেন। ছিল তাদের জন্য রিসোর্টের মতো অস্থায়ী কটেজ। সেখানে টিভি, ফ্রিজ, কুলার, রুম হিটার কী নেই। চারবেলা ঢালাও ভোজ। ১৪ তারিখ রাতে তো মেলা অফিস চত্বরে রীতিমতো পার্টি হয়ে গেল। শুধু স্ন্যাকস তৈরি করতেই সরকারি ক্যান্টিনের কর্মীদের প্রাণান্তকর অবস্থা।

অথচ, সাগরমেলার ইম্পটেন্ট পয়েন্ট কচুবেড়িয়া। রোজ ভেসেলের পর ভেসেল এসে লক্ষ লোককে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আবার ফিরিয়ে নিচ্ছে। সাগর মেলায় যাবার জন্য এখান থেকেই বাস ধরতে হয়। বাসে ওঠার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের মারামারি। কেউ-বা এই তিরিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন পদব্রজেই। কুয়াশার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেসেল ও বাস এখানে আটকে পড়েছে। রাতভর ভেসেলে বা নদীর তীরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আটকে থেকে মানুষ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। অতীতে এই কচুবেড়িয়াতেই ঘটেছে যত অঘটন। লঞ্চডুবি থেকে পদপিষ্ট হবার ঘটনা ঘটেছে এখানেই। এবারও লট নম্বর ৮-এর কাছে মুড়িগঙ্গার চরায় দুটি লঞ্চ কুয়াশার জন্য আটকে ছিল বহুক্ষণ। কিন্তু এখানে কোনো মন্ত্রীকে তদারকি করতে দেখা যায়নি। সকলেই ব্যস্ত ছিলেন ছবি তুলতে আর সাগরমেলার মহোৎসবে।

পরিসংখ্যান

মকরস্নানের পুণ্যস্নানের সময় সমুদ্র সৈকত বরাবর আরও ৩৩টি হাইমাস্ট লাইট এবং ৯০টি অতিরিক্ত ল্যাম্পপোস্ট লাগানো হয়। পুণ্যার্থীদের সুরক্ষার স্বার্থে ১৪ হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়। যথেষ্ট সংখ্যক ব্যারিকেড, পুলিশ ক্যাম্প ও ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, সিভিল ডিফেন্স, এনডিআরএফ, নেভি, ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড, ডব্লুউবিসিইএফ থেকে প্রচুর সংখ্যক কর্মীকে সাগরমেলার নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত করা হয়। ৫০ জন সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ারকে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সমস্ত হোগলার কুটিরে অগ্নি নির্বাপক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। ৩০০০ জন সিভিল ডিফেন্স, অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের ১২০ জন জলপ্রহরী সমুদ্রতটে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। সাগরমেলায় ছিল ২৪ ঘণ্টার আইসিইউ-সহ হাসপাতালের সুবিধা। ৭০০ জন স্বাস্থ্যকর্মী পরিষেবায় নিয়জিত। আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য ছিল ১ এয়ার ও একটি ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা।

এবার বাংলা, হিন্দি, মারাঠি, ওড়িয়া, তামিল, তেলুগু ভাষার পাশাপাশি ভোজপুরি ভাষাতেও পুণ্যার্থীদের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়। ২২৫০টি বাস, ৫টা বার্জ, ৪৪টি ভেসেল ও ১২০টা লঞ্চ যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য কাজ করে। কলকাতার বাবুঘাট থেকে লট নম্বর ৮ পর্যন্ত ১১টা বাফার জোনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ১২ হাজার স্থায়ী ও অস্থায়ী শৌচাগার নির্মাণ করা হয়। ৭টি কঠিন বর্জ্য পরিচালন ইউনিট, ১৮টি ই-কার্ট, সাগরতীর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ৪ হাজার ৯৮০ জন সাফাই কর্মী নিয়োজিত ছিলেন।

সমুদ্র পারের ভাঙনের জন্য কপিলমুনির মন্দির এখন সংকটে। কারণ মন্দির থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে চলে এসেছে সমুদ্র। বছর খানেক আগে ঘূর্ণিঝড় যশ আছড়ে পড়ার পর মন্দির চত্বরে সমুদ্রের জল ঢুকে পড়েছিল। অতীতে ভাঙন এবং ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে কপিল মুনির মন্দির অন্তত চারবার সাগরে তলিয়ে গেছে। নতুন করে তৈরি করতে হয়েছে মন্দির। এখনকার মন্দিরটি ১৯৭০ সালে তৈরি। ২০০০ সালেও সমুদ্র থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে ছিল মন্দির। আর এখন ভাঙতে ভাঙতে একেবারে কাছে চলে এসেছে সমুদ্র। সমুদ্র সৈকতে বসানো বৈদ্যুতিক আলোর অনেকগুলি উঁচু পোস্ট জলের তলায় চলে গেছে। শাল বল্লা ও রাশি রাশি জিও ট্যাগ বস্তা দিয়ে

তপস্থল পরিণত

গঙ্গাসাগরে তাঁর আশ্রমে বসে পুরীর গোবর্ধন মঠের শঙ্করাচার্য স্বামী শ্রী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজের সঙ্গে 'স্বস্তিকা'র পক্ষে কথা বললেন হীরক কর।

তীর্থস্থলে পর্যটনের বিকাশ হলে তা ভোগস্থলে পরিণত হয়, তখন তীর্থ আর তীর্থ থাকে না, তীর্থের বিলুপ্তি ঘটে। গঙ্গাসাগরের উন্নয়ন প্রসঙ্গে একথা বলেন পুরীর গোবর্ধন মঠের শঙ্করাচার্য স্বামী শ্রী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ। মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে গঙ্গাসাগরে তাঁর সঙ্গে বসে কথা হচ্ছিল। আদি শঙ্করাচার্যের পর এখন সারা দেশে শঙ্করাচার্য চারজন। পুরীর শঙ্করাচার্য ছাড়াও রয়েছেন শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য ভারতীতীর্থ সরস্বতী মহারাজ, দ্বারকা সারদামঠের অভিমুক্তি স্বামী স্বরানন্দ মহারাজ। আছেন যোশীমঠের শঙ্করাচার্য।

সাগরদ্বীপের ১ নম্বর সমুদ্র সৈকতে তাঁর অস্থায়ী আশ্রমে কথা হচ্ছিল নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজের সঙ্গে। যোশীমঠের সাম্প্রতিক বিপর্যয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শাস্ত্রমতে পর্বত, নদী, অরণ্যকে ভূধন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার জন্য এগুলোর স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখা দরকার। বিকাশের নামে বন-নদী ধ্বংস করা হয়েছে। তাই যোশীমঠের ঘটনা প্রকৃতির প্রতিশোধ। বিকাশ আর পরিবেশের মধ্যে কোনো বৈরিতা নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সবদিক ভেবে উন্নয়ন করতে হবে। প্রকৃতি রক্ষা করার জন্য বৈজ্ঞানিকরাই সবচেয়ে ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন। পবিত্র জলধারা আটকে

দিনরাত ভাঙন মোকাবিলা জন্য কাজ করছে সেচ দপ্তর। বস্তা ব্যবহার করে সিঁড়ি তৈরি হয়। দু'নম্বর রাস্তা শেষে সমুদ্রসৈকতে ৭০ মিটার এলাকা জুড়ে দিনরাত কাজ চলে। চেন্নাই আইআইটি ম্যাকিনটস বার্ন এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ সমীক্ষা চালিয়ে ভাঙন প্রতিরোধের একটি সার্বিক পরিকল্পনা তৈরি করে। এতে ১৪১ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়। তার মধ্যে রাজ্য সরকারের অংশ ছিল ৬৬ কোটি টাকা।

মেলা

এবারের সাগরমেলার মূল আকর্ষণ মহাসাগর আরতি। সাগরসঙ্গমে ঢাকের বোলে, শঙ্খধ্বনিতে, কপিলমুনির মন্দিরের পুরোহিতদের পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এই আরতি হয়। পরপর তিন দিন সন্ধ্যায় চলে এই গঙ্গাআরতি। মেলায় আধ্যাত্মিক আলোচনার জন্য হয় সাগরপ্রবচন। বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দেশ-বিদেশের ভক্তরা এতে অংশ নেন। সাগর প্রবচনে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, রাশিয়া, ইউক্রেন, নিউজিল্যান্ড, ব্রাজিল ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভক্তরা তাদের বক্তব্য পেশ করেন। সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণে গঙ্গাসাগরের এই মঞ্চ আধ্যাত্মিক ও শান্তির বার্তা প্রচারের মঞ্চে পরিণত হয়। ইসকনের রমেশ মহারাজ জানান, ১৭টি দেশের ৬০ জন বিদেশি-বিদেশিনী গঙ্গাসাগরে নাম-সংকীর্তনে অংশ নিয়েছেন।

গঙ্গাসাগর মেলা অ্যাক্ট হয় ১৯৫৩ সালে। ৭৫ সালে হয় গঙ্গাসাগর অডিটোরিয়াম। ফাইনালি গঙ্গাসাগর মেলা অ্যাক্ট হয় ১৯৭৬ সালে। ১৯৮৪ সালে মেলার দায়িত্ব নেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষে মেলার পরিকাঠামো তৈরির ভার দেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর অর্থাৎ পিএইচই-কে। মেলা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসককে। তার আগে মেলা পরিচালনা করত কপিলমুনির আশ্রমের অযোধ্যা ট্রাস্ট। কচুবেড়িয়ায় জেলাশাসকের কন্ট্রোল রুমে বসে কথা হচ্ছিল রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব মনীশ গুপ্তের সঙ্গে। মনীশবাবু প্রথম জীবনে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার। আইএএস হবার পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক

হয়েছে ভোগস্থলে— শঙ্করাচার্য

বিকাশ করলে বিনাশ অনিবার্য। বিকাশের গর্ভ থেকে বিনাশের জন্ম। তাঁর ধারণা, বিকাশের মুখোশ করোনা খুলে দিয়েছে। আমেরিকা, চীন, জাপানের মতো দেশ সবচেয়ে

ভুগেছে। তিনি জানান, যিশুখ্রিস্ট তিন বছর পুরীতে ছিলেন। তাকে মারার চক্রান্ত হয়। তিনি হাঁটতে হাঁটতে কাশ্মীরে এসেছিলেন। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। সেখানে তার সমাধি আছে। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম অনুসরণ করে কপালে তিলক আঁকতেন। তাঁর প্রমাণ বাইবেলেও আছে।

গঙ্গাসাগর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কপিলমুনির অভিশাপে রাজা সগরের পুত্ররা এখানে দেহ রেখেছিলেন। পরে মা গঙ্গা এখানে এদের শাপমুক্ত করেন। তাই এটি তীর্থক্ষেত্র। সমুদ্রের অপর নাম সাগর। ভগবানের বিভূতির অন্যতম সাগর। তাই তীর্থের সুস্থতার ওপর নজর রাখতে হবে। ঝাড়খণ্ডের একটি জৈন তীর্থকে পর্যটন স্থলের রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদে এক জৈন সাধু অনশনে বসেছিলেন। যাতে তপোস্থলকে ভোগস্থলে পরিণত হতে না দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার পিছু হটে। পর্যটন কেন্দ্র হলে তা ভোগস্থল হয়ে যাবে। যোশীমঠ থেকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত এখনও পায়ে হেঁটে যেতে হয়। তাই সেখানে ধর্ম এখনও অবস্থান করছে বলে শঙ্করাচার্যের অভিমত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দিশা দেখানো সম্ভব। বিকাশ, পরিবেশ ও রাজনীতি তিনটে দিক। এই তিনটিকে সমন্বয় করে কর্ম করতে হবে। তবে ভালো ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে দেশের সুমঙ্গল হবে। কিন্তু এগোতে হবে বর্তমানকে সামনে রেখে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময়ই কেন্দ্রের খারাপটাই দেখেন। নিজে প্রচারে থাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেন।

তাঁর অনুভব, 'হিন্দু' ও 'হিন্দ' দুটি শব্দ একটি ভৌগোলিক অঞ্চলকে নির্দেশ করে। মানস সরোবর থেকে হিন্দু সাগর অর্থাৎ কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত অঞ্চলই হিন্দুস্থান। 'হিন্দু মহাসর্প', 'হিন্দুকোষ', এগুলো প্রাচীন কলা। 'হিন্দু' প্রাচীন শব্দ। ■

হিসেবে প্রথম মেলা পরিচালনা করেন। এক সময় পিএইচই-র সচিব হিসেবে মেলার পরিকাঠামো গড়ে তোলেন। পরিবহণ ও স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন। চাকরি জীবনের শেষ চার বছর মুখ্যসচিব হিসেবে মেলার দায়িত্ব সামলেছেন। সারা জীবনই সাগরমেলার সঙ্গে জড়িয়ে। অবসর গ্রহণের পর রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী হয়েছেন। এখন অবশ্য প্রাক্তন। তবুও ২৭ বছর ধরে সাগরমেলায় যাচ্ছেন। এবারেও কচুবেড়িয়ায় ডিএম কন্ট্রোল রুমের সার্কিট হাউস, জেলা পরিষদের ভবন, ইয়ুথ হোস্টেল হয়। তখন মেলা অফিস ছিল টিনের চালের। ১৯৮৪ সালে একবার নৌকাডুবি হয়েছিল। জেনারেটর তুলে দিয়ে মেলায় লাইট লাগানো হয়। মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় মনীশ গুপ্তকে বলেছিলেন, আপনি তো মশাই মেলায় দেওয়ালি করে দিলেন।

এত আনন্দ-আয়োজনের মধ্যে দুধে চোনাও পড়েছে। বিশেষ করে কচুবেড়িয়ার লঞ্চ পরিষেবার বিভ্রাট। কিন্তু তার জন্য প্রকৃতি দায়ী হলেও ম্যান ম্যানেজমেন্ট ভিলেন, যার সঙ্গে লড়তে যাওয়া বোকামি? লঞ্চের সারেং যে জানালেন কুয়াশা কাটলে সকাল ১০টা থেকেই ফেরি পারাবার শুরু হয়েছে। তবে সূর্য ঢলা পর্যন্ত সাগরমেলায় সাংবাদিকদের আটকে রাখা হলো কেন? কেনই-বা বলা হচ্ছিল সে রাতের মতো গঙ্গাসাগরে থেকে যেতে। এও এক রহস্য!

যতবার আসি ততবার এই গঙ্গাসাগরেই বারবার খুঁজে বেড়াই অনন্ত এক শক্তিকে। যিনি এই বিশ্ব চরাচর নিজের আপন তালুতে রেখেছেন। আর খুঁজে বেড়াই তাঁদের যারা

তদারকিতে ছিলেন। ১৯২২ সালে মেলার তীর্থকর ছিল ১ পয়সা। পরে ১ টাকা হয়। বামফ্রন্ট সরকারের আসলে পিলগ্রিম ট্যাক্স ছিল ৫ টাকা। এখন সেই ট্যাক্স উঠে গেছে। যাত্রীদের কোনো তীর্থকর দিতে হয় না। ১৯৮০ সালে মনীশ গুপ্ত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক। সে বছর আবহাওয়া দপ্তরের খবর ছিল বঙ্গোপসাগরে গড়ে ওঠা একটি সাইক্লোন আছড়ে পড়বে সাগরদ্বীপে। রাতারাতি ৪ লক্ষ লোককে সরাতে হয়। শেষ পর্যন্ত ওই সাইক্লোন গঙ্গাসাগরে হিট করেনি। আছড়ে পড়েছিল ওড়িশায়। গঙ্গাসাগরে প্রথম পাকা বাড়ি হয় সেচ দপ্তরের জমিতে। বিভাগও দায়িত্ব এড়াতে পারে না। দুপুর সাড়ে বারোটায় লাগেজ বইয়ে আনিয়ে সাংবাদিকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয় সাগরের ওল্ড বাসস্ট্যান্ডে। এক সময় বলা হয় সাংবাদিকদের গঙ্গাসাগর মেলার ক্যাম্পে ফিরে যেতে। বলা হয়, সে রাত্রিটাও সাগরমেলায় থেকে যেতে। কিন্তু কলকাতায় ফেরার জন্য সাংবাদিকদের জেদের কাছে পিছু হটেন দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকরা। সন্ধ্যে হলেও কচুবেড়িয়া জেটি থেকে সাংবাদিকদের নিয়ে লঞ্চ ছাড়ে। রাত দশটায় সাংবাদিকরা কলকাতায় পৌঁছন।

কিন্তু ঘনঘোর কুয়াশাই কি এর পিছনে সূক্ষ্ম শরীরে আকাশ পথে আসেন। মনন অনন্ত ব্রহ্মে একত্রিত করতে পারলে ভেপারের আলোয় ঘুরতে ঘুরতে অনুভবে পাই। উপলব্ধি করি তাঁদের মন্ত্র উচ্চারণ। সাগরের ঢেউয়ের মতোই অনন্ত সেই খোঁজ। এভাবেই বছর বছর পুণ্যমেলা মেতে উঠবে আপন ছন্দে পরমানন্দে। এই খোঁজের আহ্বানেই কত মানুষের ধারা দুর্বার স্রোতে এসে এক হবে। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতেই হয়, ‘হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে/জাগো রে ধীরে...এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে’। একটু পালটে বলি, ‘মহামিলনের সাগরতীরে’। ■

চারিদিকে মাননীয়ার মুখ, বিরক্ত পুণ্যার্থীরা

বিশ্বপ্রিয় দাস

বাংলায় একটা কথা আছে, 'আপনি আচরি ধর্ম অন্যরে শেখাও', আবার আর একটি কথাও এই লেখার শুরুতে আসতেই পারে যে এমন নির্লজ্জ একটি দল এখন রাজ্যে শাসন করছে, যাদের না আছে নীতি, না আছে বোধ। কেন এই কথাগুলি শুরুতেই আনতে হলো, তার একটু বিশদে আসার চেষ্টা করা যাক।

ধর্ম নিয়ে রাজ্যের শাসক দল বারে বারে তোপ দাগে বিজেপি দলের বিরুদ্ধে। নিজেরা নিজেদেরকে ধোয়া তুলসীপাতার রূপে প্রকাশ করে, এটা বোঝাতে চায় যে তাঁরা একেবারেই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে না। বা ধর্মের ধ্বজা ধরে নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনাকে ছড়িয়ে দিতে চায় না। বাস্তবে ঠিক উলটো পথেই হাঁটে সরকার। তার প্রমাণ ভুরি ভুরি ছড়িয়ে আছে রাজ্যের আনাচে কানাচে। রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো বায়বীয় পদার্থের চেহারায় নানা ধর্মের মধ্যে মিশে গিয়ে, নিজের রাজনৈতিক প্রচার করে চলেছেন।

গত কয়েকদিন আগে হয়ে গেল এশিয়ার অন্যতম বড়ো ধর্মীয় একটি উৎসব। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সেই উৎসবে হাজির হয়েছিলেন সারা ভারত আসা থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী। সাগর সঙ্গমে সারা ভারতের মানুষের সামনে রাজ্যের রাজনীতির নির্লজ্জ চেহারার প্রতিচ্ছবি খুব একটা ভালো দেখালো না। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হেনে সেই প্রচার চলল গোটা উৎসবের সময় জুড়ে। এই প্রতিবেদক সাগর সঙ্গমে আসা ভিন্ রাজ্যের মানুষদের জিজ্ঞাসা করেছিল, এটা তাঁরা কেমন ভাবে দেখছেন? ওদিকে হাওড়া থেকে লট ৮ আবার কচুবেড়িয়া থেকে সাগরতট বা

কপিলমুনির মন্দিরের আশেপাশে রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমোর ছবিতে ভরিয়ে দেওয়াটাকে মানুষজন যে ভালো চোখে দেখেনি, সেটা বোঝা গেছে তাঁদের কথাবার্তাতেই। মহারাষ্ট্র থেকে আসা এক পুণ্যার্থী জগমোহন বললেন যে, প্রথম কথা, তিনি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা খুব একটা জানেন না। আর চেনেনও না। তবে এই ধর্মের জায়গায় এভাবে ঈশ্বর দর্শন করতে এসে প্রতি পদে, তাঁর ছবি দেখতে হচ্ছে, সেটা মানতে পারছেন না সবাই। গুজরাট বা রাজস্থান, কিংবা দিল্লি, এমনকী নিজের রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের মানুষজনও এটাকে নিয়ে বেশ কটূক্তি করেছে এই প্রতিবেদকের সামনে।

গঙ্গাসাগরকে কেন্দ্র করে কেন এই প্রচার? আসলে তৃণমূল সুপ্রিমোর মুখটাকে সারা ভারতের মানুষের কাছে চেনানোই একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করছে মানুষ। কারণ হিসেবে তাঁরা বলতে চাইছে যে বেশ কয়েকটি রাজ্যে এই বছর এবং ২০২৪ সালে বিধানসভা ভোট। এছাড়াও রয়েছে লোকসভার ভোট। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে জাতীয় দল হিসেবে একটা স্বীকৃতি জুটিয়ে নিতে। আর এটা পেতে গেলে দরকার ভিন রাজ্যে ক্ষমতায় আসা, একটা নির্দিষ্ট শতাংশের ভোট পাওয়া। এ দুটি পেতে গেলে এই রাজ্যের মতো নিজের মুখটাকে প্রোজেক্ট করতে হবে বাইরের রাজ্যেও। সেই পথ ধরেই চলছে রাজ্যের শাসক দল। অন্যদিকে আরও একটি বিষয় দেখা গেছে এবারের গঙ্গাসাগর মেলায়, ওখানে থাকা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও মন্ত্রীদের মুখে, সে সাংবাদিক সম্মেলন হোক বা প্রচার সব জায়গা জুড়ে রয়েছেন তিনি। সুপ্রিমোর গুণকীর্তন সমৃদ্ধ রাজনৈতিক প্রচারে এবারের গঙ্গাসাগর ছিল একেবারেই সরগরম। একটি ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করে রাজ্যের শাসকদলের এই নির্লজ্জ প্রচার, মেনে নিতে পারেনি মেলায় আসা মানুষজন। তাঁদের বক্তব্য, সাধুসন্ত সমাগমে এই মেলা। তাই মেলায় থাকা উচিত ছিল ধর্মীয় নানা কথার প্রচার। যেমনটি দেশের অন্য মেলাতে হয়। তা না হয়ে সেখানে রাজনৈতিক প্রচার! এখানেও সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের নেতা থেকে মন্ত্রীরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেন। তাহলে কি বলা যায় না, ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক প্রচারে অন্য দলের থেকে একশো শতাংশ এগিয়ে আমাদের রাজ্যের শাসক দল?

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে নিজেকে প্রচারের আলোয় আনতে কসুর করেননি মুখ্যমন্ত্রী। এই নির্লজ্জতা দেশের অন্যকোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেখান কিনা জানা নেই। ■

কুকথার বান রুখতে সহবতের পাঠ দিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ড. জয়ন্ত কুশারী

'তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল।/সুধা সাগরের তীরেতে বসিয়া, পান করে শুধু হলাহল।'

কথাগুলো বলছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গানের মাধ্যমে। এ তো কেবল গান নয়। এ হলো তাঁর নীরব অভিমান। এক কথায় বলা যায়, এ হলো কবি সার্বভৌমের খেদোক্তি। তাঁর আরাধ্যের প্রতি। সংসারের প্রতি। সমাজের প্রতি। মানবজাতির প্রতি। মানুষ যখন ক্রমশ দেউলিয়া হয়ে যায়— নীতিগত ভাবে, আদর্শগতভাবে, মানবিক সম্পদগত ভাবে, আচরণগত ভাবে ও ভাষাগতভাবে। একই সঙ্গে দেহের ভাষায় আর মুখের ভাষায়। তখনই জন্ম নেয় কুকথার। কুকথার সীমানা ছাড়ালে বান ডাকে কুকথার।

সম্প্রতি একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে গেল, রাজ্যের বিচারব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। যা শুধু আমাদের বিচলিতই করে না, তা ভাবলে আতঙ্কিত হতে হয়। বিচারক ও তাঁর ন্যায়বিচার দান আজ কুকথার দ্বারা আক্রান্ত। সামাজিকক্ষেত্র, রাজনৈতিক ক্ষেত্র, বিধানসভা, লোকসভা, রাজ্যসভার গণ্ডি ছাড়িয়ে এই কুকথায় আজ বিদ্ধ হচ্ছে উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারব্যবস্থা। উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারকের আবাসেও পোস্টারিং হচ্ছে আজ। কুকথার ব্যাপারিদের এই ন্যক্কারজনক আচরণ দেখেও প্রশাসনিক স্তরে কোনো হেলদোল নেই। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচারব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই বিচারব্যবস্থার ও বিচারকের এহেন অবমাননা প্রত্যক্ষ করেও অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে।

রাজ্যের সাধারণ মানুষ যখন প্রশাসনিক স্তরে ন্যায়বিচার পান না কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়, তখন তাঁরা ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হন। সুবিচার পাওয়ার জন্য। এখন সেই ন্যায়ালয় এমনকী উচ্চ ন্যায়ালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিচারক পর্যন্ত আক্রান্ত। কুকথার দ্বারা। প্রশ্নের মুখে পড়েছে সুরক্ষা বলয়ে বেষ্টিত উচ্চ বিচারালয়ের ও বিচারকের এহেন অবস্থা হলে নিরাপত্তাহীন রাজ্যবাসীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

সহবত। একটি শব্দবন্ধ। রোজকার আদর্শ আচরণবিধি পালনের নির্দেশিকা। নির্দেশিকা পালনে মানুষ হয়ে ওঠে আদর্শ। অন্যের কাছে। অন্যের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। অনেকগুণ। গুণগত মান মূল্যায়নে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে মানুষ। মানুষ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, মান আর হুঁশ-এর সমন্বয়ে। এমনটাই বলছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি আরও বলছেন, মানও থাকতে হবে আবার হুঁশও থাকতে হবে। তবেই সে মানুষ। আর ঠিক এখান থেকেই সহবতের প্রথম পাঠ দিলেন ঠাকুর— নৈতিকতার স্খলন, মানবতার পতন আর ভাষার এহেন দূষণ দেখে। আমরা আসব সে কথায়। এখন দেখে নেওয়া যাক, কুককথার বান আমাদের সমাজজীবনকে কতটা প্লাবিত করেছে। সুদূর অতীত থেকে অতি সম্প্রতি। সব

কালকেই তুলে ধরার একটা চেষ্টা করা যাক।

সেটা ছিল রামায়ণের কাল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বাণে ততক্ষণে ধরাশায়ী হয়েছেন মহাবীর বালী। তিনি কী ভাষায় বিঁধলেন প্রতিপক্ষ শ্রীরামচন্দ্রকে। রাম, তুমি দুরাত্মা ধর্মধ্বজী, অধার্মিক, তৃণাবৃত কূপ ও প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় সাধুবেশী পাপাচারী। কাকুৎস্থ, বিনা অপরাধে আমাকে শরাঘাতে বধ করেছ। এই গর্হিত কর্ম করে সাধুসমাজে তুমি কী বলবে?

উত্তরে মার্জিত রুচিশীল ভাষায় শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, কেন তোমাকে বধ করছি তার কারণ শোনো। তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ভ্রাতৃজায়াকে গ্রহণ করেছ। তুমি পাপাচারী, মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন, তাঁর পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূস্থানীয়া, কামবশে তুমি তাঁকে অধিকার করেছ। বানর তুমি ধর্মহীন, কামাসক্ত, ভ্রাতৃবধূকে ধর্ষণ করেছ। এজন্য এই বধদণ্ডও তোমার পক্ষে বিহিত।

তখন বালী কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, 'নরশ্রেষ্ঠ, তুমি যা বলেছ তা যথার্থ। আমি প্রমাদবশে পূর্বে যে অপ্রিয় কথা বলেছি, তার জন্য দোষ নিও না। আমাকে ক্ষমা কর।' এই শিষ্টাচার আজ আর তেমনভাবে দেখা যায় না। আসা যাক মহাভারতের কালে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব ছিলেন দুর্যোধনের জামাই। তা সত্ত্বেও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, 'কৃষ্ণ' 'তুমি অকস্মাৎ যশস্বী হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমরা জানি তুমি পুংশ্চিহ্নধারী নপুংসক।' এজাতীয় ঔদ্ধত্যপূর্ণ নেতিবাচক কুকথার কুনাট্য রচনা করেছেন দুর্যোধন তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে। দুর্যোধনের মতো রাজলোভী বা প্রভুত্বলোভী, ধর্মজ্ঞানহীন দুর্মুখ, ক্রূর দুরাত্মা এখনও দেখা যায়।

সাম্প্রতিক অতীত থেকে অতি সম্প্রতি আমাদের সমাজজীবনে যে কুকথার আবহ তৈরি হয়েছে, সে বিষয়ে এখন আসা যাক। কে কী বলেছেন তা নিয়ে কিছু বলব না। তবে ইদানীং রাজনীতিতে অতি কদর্য ভাষায় একে অন্যকে বিঁধছেন তা আমাদের বড়ো কষ্ট দেয়।

এ বিষয়ে সমালোচনার ঝড় বইলেও রাজনীতিকদের তরফ থেকে তার কোনো ব্যাখ্যা মেলেনি। প্রতিপক্ষ নেতার সঙ্গে মতাদর্শগত বৈরিতা থাকতেই পারে। তা বলে প্রতিপক্ষকে অশ্লীল মন্তব্যে, অশালীন দেহভঙ্গিমায় আক্রমণ করতে হবে? অথচ এটাই এখন রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত পরিসরের ভাষার ফারাকটাও সভ্যতা ধরা হতো। পশ্চিমবঙ্গে আজ একে অপরকে যে ভাষায় বিঁধছেন তা প্রবীণদেরও বিস্মিত করছে।

বাঙ্গালির ইতিহাসে রামমোহন বিদ্যাসাগরে কটূক্তির নজির রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রও রাজনীতির বিরুদ্ধতায় কারও কাছে তীব্র ভাষায় নিন্দিত হয়েছেন। সংসদীয় রীতি মেনে জনপ্রতিনিধিদের পারস্পরিক পা টানাটানি বা টিপ্পনীর বহু নমুনাও মিশে আছে রাজ্য বিধানসভার কার্যবিবরণীতে। অপশব্দ প্রয়োগে বিধানসভায় শাস্তি পেয়েছেন কোনও কোনও জনপ্রতিনিধি। কিন্তু শাসক বা বিরোধী শিবিরের অনেকেই অপশব্দ ব্যবহার না করে গালমন্দ করার কায়দাও জানতেন। তাতে রসবোধও থাকত আবার শিক্ষণীয় ব্যাপার বা বিষয় তৈরি হতো অনুজ রাজনীতিবিদদের কাছে। বলার ভঙ্গিতে স্পিকার তা কার্যবিবরণীতে রাখতে বাধ্য হতেন।

এখন টুইটারে গেলেই বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতের জন্য জনে জনে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করছেন। অনেক নামি-দামি নায়ক- নায়িকাও। টেলিভিশনের পর্দায়, রাজনৈতিক বক্তৃতায় প্রতিপক্ষকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ চলে। 'সৌজন্যের রাজনীতি' এমন একটা শব্দ— বুঝি তার ভবিষ্যত নিয়ে ভাবার সময় আজকের রাজনীতিবিদদের আছে বলে মনে হয় না, অন্তত তাঁদের আচরণ তো এমনটাই বলে।

এমনই আবহে সহবতের দ্বিতীয় পাঠটি শুরু করলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর বলছেন, 'তোরা মানুষ হ।' মানুষ যদি মানুষ না হয় তাহলে সেই সমাজের কী মূল্য থাকে? তাতে তো হিংস্র পশুর আবাস ভূমি— আস্ত একটা জঙ্গল হয়ে যাবে এই সমাজটা। আমরা হাইরাইজ অনেক বাড়ি করলাম। ঝাঁ-চকচকে রাস্তা হলো। মোড়ে মোড়ে আইল্যান্ড হলো। রংবাহারি আলোর সাজে ফোয়ারা হলো, রাস্তার দু' পাশে চোখ জুড়ানো বাগান হলো। জনে জনে বাড়ি বাড়ি, আসবাব, সোনাদানা সবকিছু হলো। রইল না বেকারত্বের জ্বালা, কিন্তু রূপকার মানুষগুলোর কী অবস্থা হলো? মানুষগুলো? মানুষগুলো নিজেকে ছাড়া অন্যকে ভালোবাসে না। চার দেওয়ালের মধ্যে থাকলেও একের বিপদে অন্যের চোখে জল আসে না। তাই পাশে দাঁড়ানোর কথা ভাবে না। দাঁড়ানো দূরের কথা। সবই কেমন কিম্ভূতকিমাকার। আড়ে-বহরে আস্ত মানুষ। আচারে-ব্যবহারে-স্বভাবে কিন্তু বন্য হিংস্র জন্তুকেও হার মানাবে। তাহলে কী দাঁড়াল? আমাদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হলেও জীবনের মান একেবারে তলানিতে ঠেকল। জীবনযাত্রার মান নিশ্চয় উন্নত করব। একই সঙ্গে জীবনে উৎকর্ষ আর চরিত্রের বিকাশ সাধনে যত্নবান হব আমরা। এবার ঠাকুর সহবতের তৃতীয় পাঠটি আমাদের দিলেন। ঠাকুর বললেন, 'তোদের চৈতন্য হোক।' জীবনের ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের চরম প্রকাশ হলো চৈতন্য— যা আসে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। একে অন্যকে ভালোবাসলে, অন্যের শুধুমাত্র সম্পদে নয় বিপদেও নিজেকে নিয়োজিত করলে। চাই প্রেম, চাই ভালোবাসা, চাই মৈত্রী, চাই সহমর্মিতা— নয় কুকথা, নয় কুনাট্য রচনা, নয় ভাষার দূষণ, নয় প্রতিপক্ষকে কদর্য আক্রমণ। বৈদিক ঋষি থেকে যুগপুরুষ যাঁরা তাঁরা সকলেই কিন্তু একই কথা বলেছেন, আর চেয়েছেন উন্নততর মানুষের আবাসভূমি হোক এই পৃথিবী।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-অর্থ-ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচিয়ে সকলেই সুখী হোক, সকলেই নিরাময় হোক, সকলেই সকলকে যেন ভালো চোখে দেখে। কোনও মানুষই যেন দুঃখের ভাগীদার না হয়। এসবই আসলে চৈতন্যোদয়ের মূল কথা। যে কথা আচরণে এবং সহজ সরল বোধগম্য ভাষায় বলে ও বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

(লেখক সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা আকাদেমির অধ্যক্ষ)

‘হিন্দু’ নামের উৎস সন্ধানে

সৌমেন নিয়োগী

‘হিন্দুদুষ্ট নৃহঃ প্রোক্তোহনার্মনীতি বিদুষকঃ।
সদ্ধর্ম-পালকোবিদ্বান্ শ্রেতি ধর্মরায়ণঃ।’

অর্থাৎ দুষ্টের দণ্ডদাতা, অনার্যনীতির বিরোধী, সদ্ধর্মের পালক ব্যক্তিই হিন্দু। উপরের শ্লোকটি ‘রামকোষ’ নামক প্রাচীন অভিধানে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত, যেখানে হিন্দু শব্দটি সুস্পষ্টভাবে এক ঐতিহাসিক রচনার প্রামাণ্য উদাহরণ রূপে সংরক্ষিত। এখন ‘রামকোষ’ কবে রচিত, তার প্রাচীনত্ব কত, এসবও বিতর্কের মধ্যে এসে যায়। ঋক্‌বেদ ও অন্যান্য পৌরাণিক রচনাতে নাকি এই হিন্দু শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না, যা আমরা প্রচলিত মত ও ধারণা হিসেবে বহু পণ্ডিত ও ভাষাবিদের ব্যাখ্যা থেকে জেনে এসেছি। যেখানে সাধারণ আপামর সিদ্ধ সিদ্ধান্ত স্বরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে ‘হিন্দু’ শব্দটি বহিরাগতদের দেওয়া নাম। যেখানে জরথুষ্ট ধর্মাবলম্বী অগ্নি উপাসক প্রাচীন ইরানীয়রা ‘স’ উচ্চারণ করতে না পারায় ‘হ’ উচ্চারণ করত, ফলে ‘সিন্ধু’ হয়েছে ‘হিন্দু’। এবং জোরের সঙ্গে উদাহরণ হিসেবে পার্শিদের ‘জেন্দ্ আবেস্তা’ থেকে ‘হপ্তহিন্ধু’ নামটি ‘সপ্তসিন্ধু’ দ্যোতক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছে, যা মিথের ধারণা নিয়ে নিয়েছে।

Sir William Jones কর্তৃক তুলনামূলক ভাষাভিত্তিক ইতিহাস অনুসন্ধান ভারতবাসীকে তার প্রাচীনত্বকে প্রমাণের জন্য বিদেশিদের মতের ভিত্তিতে প্রোতিথ করেছে। আমাদের যা কিছু সবই বিদেশিদের দেওয়া বা তাঁদের সাহায্যে সৃষ্ট, কাজেই ‘হিন্দু’ শব্দটির ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রমের অবকাশ রইল না। যেখানে বারবার বলে আসা হয়েছে ‘স’-কে ‘হ’ উচ্চারণের ফলে সিন্ধুনদের অববাহিকায় বাস করা জনগোষ্ঠী ‘সিন্ধু’ অপভ্রংশ হয়ে উচ্চারিত হয়েছে ‘হিন্দু’ শব্দে। সাময়িক বিতর্কের ক্ষেত্রে যদি ধরেও নিই এটাই সঠিক তাহলে ভাষাবিদদের কাছে একটা সহজ প্রশ্ন করা যেতে পারে। তাহলে ‘সিন্ধু’ অঞ্চলে এই নাম সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু হিন্দু শব্দটি সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত। এতে প্রমাণ হয় সিন্ধু থেকে হিন্দু হয়নি। এবার আসা যাক ‘স’-কে যদি ‘হ’ বলা হতো তাহলে ‘স’ দিয়ে আরও যে শব্দ আছে তাদেরও পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা হয়নি। যেমন সিমালয় হিমালয় হয়নি, সিন্ধুকুশ হিন্দুকুশ, মুসলমান মুহলমান, পার্সি পার্হি হয়নি, কাজেই শব্দের উচ্চারণের অপভ্রংশের থেকে এই শব্দটির উৎপত্তি সেই মত কখনই গ্রহণ করা যায় না।

বৈদিক ও পৌরাণিক শব্দকোষ অনুসারে হিন্দু-ইন্দু-সিন্ধু পরিবাচক সংস্কৃত শব্দ। ঋষি বেদব্যাসের ‘মেদানি’ ও কালিকাপুরাণে হিন্দু শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। অগ্নি উপাসক জরথুষ্টদের প্রাচীন শাস্ত্র ‘শাতির’-এ হিন্দু শব্দ পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় হলো আফগান শহর ‘বালখ্’ বা বালখ্‌নসরকে ‘হিন্দু ওয়ার্’ বলে সম্বোধন করা হতো। ঋক্‌বেদ অনুসারে ‘স’ ও ‘হ’ অভেদ, সেই অনুসারে ভবিষ্যপুরাণে বহুবার এই দেশকে সিন্ধুস্থান, হিন্দুস্থান যা আর্যদের প্রকৃতনিবাস বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কালিকাপুরাণে ‘হিন্দুবাহ্’ হিন্দু বেদ মার্গীয়, সত্যপথ অবলম্বনকারীদের বলা হয়েছে।

হিন্দু শব্দভাগের দ্বারা সেই ব্যক্তিকেই সম্বোধন করা হয়েছে যিনি গুণী, সকল প্রকার হিংসাকে পরিত্যাগ করেছেন অথচ দুষ্টের দমন, বেদ ও গোরক্ষায় সদা কর্তব্যরত। এছাড়াও ‘পারিজাতহরণ’ নাটকে, ‘মাধবদিক্‌বিজয়’ কাব্যে হিন্দু শব্দ ব্যবহার ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এমনকী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে ৯২ অধ্যায়ে দাক্ষিণাত্য অনুচ্ছেদে আর্যবর্তকে হিন্দুস্থান বা সিন্ধুস্থান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯১২ সালে N.B. Pavgee তাঁর রচিত ‘Self Government in India’ গ্রন্থে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি ভারতের ভৌগোলিক বর্ণনা থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। যেখানে সংস্কৃত পণ্ডিত মঙ্গলনাথজী কর্তৃক পঞ্জাব প্রদেশে হোশিয়ারপুর জেলার অন্তর্গত শ্যাম নামক গ্রাম থেকে প্রাপ্ত বৃহন্নারদীয়পুরাণে একটি বিশেষ শ্লোকের উল্লেখ রয়েছে :

‘হিমালয়ং সমরভ্য যাবদিন্দু সরোবম্।
হিন্দুস্থামিতি যতম্হ অন্তরীক্ষ্যগাথা।’

A. Krishna Kumar হিমালয়ের ‘হি’ এবং যুক্ত শব্দ ইন্দুর অক্ষরদ্বয় ‘ন্দু’ দ্বারা বিন্দু সরোবর অর্থাৎ কন্যাকুমারী সমুদ্রকে ওই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিকেই হিন্দুস্থান বলে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন।

এ ব্যাপারে দুরদর্শনে এক অনুষ্ঠানে সুব্রহ্মণ্যম স্বামীও অনুরূপ মত পোষণ করেছিলেন।

স্মরণাতীতকাল থেকে আমরা জেনে এসেছি ‘হিন্দুকুশ’ পর্বতমালার নাম। যার গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে মধ্যএশিয়া থেকে ভারতে প্রবেশ করতে অতিক্রম করতে লাগে এবং ‘কুশ’ অর্থাৎ নিধন অর্থাৎ যে পর্বতে হিন্দুদেরকে নিধন করা হয়েছিল। এবং বিভিন্ন সেকুলার পন্থীরা এটা প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করছেন যে ‘কুশ’ নিধন নয় বরং আরবি শব্দ ‘কোহ্’ অর্থাৎ পর্বত। কাজেই এটি আরবি নামকরণ যা প্রকারন্তরে ‘Mountains of India’ বলে বোঝায়। কিন্তু সত্যটি হলো ‘হিন্দুকোহ’ যা আফগানিস্তানের পুস্ত ভাষায় প্রচলিত অর্থাৎ ‘Mount India’ পাস্ত ইরানীয় ভাষা যা ফার্সি ভাষার কাছাকাছি এবং সেখানে ‘হিন্দুকোহ’ অর্থে ‘India Mountaion’-কেই বোঝায়, হিন্দুকুশ নয়। এছাড়া এটাও বলা হয়েছে, ১৩৩৩

খ্রিস্টাব্দের আগে বিখ্যাত পরিব্রাজক 'ইবন বতুতা'র লেখায় হিন্দুকুশ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়নি তা ১০০০ খ্রিস্টাব্দে এক জরিপে প্রথম পাওয়া যায়। এর মানে কেউ কিন্তু বলেনি যে 'ইবন বতুতা' হিন্দুকুশ নামের জনক, বরং তিনি এই নামটি বহু পূর্বেই প্রচলিত ছিল বলে তাঁর রচনায় উল্লেখ করে গেছেন। কারণ ভারতবর্ষ আক্রমণকারী মুসলমানেরা বহু হিন্দুকে এই পর্বতের গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে ক্রীতদাস স্বরূপ স্থানান্তর করার সময় নিহত হয় ফলে হিন্দুদের নিধনক্রিয়া গিরিশ্রেণীতে সংগঠিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বহু আগে 'হিন্দু' নামের পরিচিতি ছিল, শুধু হিন্দু নিধনের ফলেই তার নামকরণ 'হিন্দুকুশ' হয়েছে এটা সঠিক নয়। 'সিন্ধুনদের তীর থেকে শুরু করে গঙ্গানদীর মোহনা পর্যন্ত হিমালয়ের দক্ষিণবর্তী এই ভূভাগের সব থেকে পুরানো বর্ণনা পাওয়া যায় হেরোডোটাস ও মেগাস্থেনিসের বর্ণনায়। মেগাস্থিনিস তাঁর ইন্ডিকা নামের পুস্তকটি রচনা করেছিলেন আজ থেকে প্রায় ২৩০০ বছর আগে। বিশেষজ্ঞরা জানান যে আজ থেকে ২০০০ বছর আগে 'স্তান' শব্দাংশটি যুক্ত হয়ে 'হিন্দুস্তান' শব্দের সৃষ্টি হওয়ার কথা জানতে পারা যায়। (Source সূত্র https://wikipedia.org/wiki/Nomes–fer–India)' কাজেই হিন্দুকুশ পর্বত শ্রেণীর নামের সঙ্গে যুক্ত হিন্দু শব্দটিও প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

'হিন্দু' শব্দের এপিগ্রাফিক প্রমাণ পাওয়া যায় পার্সিয়ান সম্রাট দারিয়াস প্রথমের হামদান, পার্সেপোলিস এবং নকশ-ই-রুস্তম শিলালিপিতে যেখানে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে রয়েছে 'হিন্দু' জনসংখ্যার উল্লেখ। পারস্য সম্রাটের এই শিলালিপিগুলি খ্রিস্টপূর্ব ৫২০-৫২৪ এই বাস্তবতাকেই ইঙ্গিত করে। শুধু দারিয়াস প্রথম নয় বরং তাঁর উত্তরসূরি জেরেক্সস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৫) এবং আর্ট্যাক্সেরেক্সের (খ্রিস্টপূর্ব ৪০৪-৩৯৯) শিলালিপিতেও পাওয়া যায়। অশোকের শিলালিপিতে 'হিদ' শব্দের ব্যবহার এবং এর থেকে উৎপন্ন রূপগুলি বহু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। 'আবেস্তান গথে' শতিরের প্রথম অধ্যায় ১৬৩তম শ্লোকে বেদব্যাসের 'গুস্তাশপের' দরবারে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং বেদব্যাস জরথুস্ট্রের উপস্থিতে নিজের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই উক্তি নিয়ে ম্যান মার্থে আমি হিন্দ জিজদ' অর্থাৎ আমি 'হিন্দ'তে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি, বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৩৯০০ কাজেই 'হিন্দু' শব্দটিও নিসন্দেহে ততোধিক প্রাচীন।

গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী ও হেকাতিয়াস খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁদের রচনায় 'ইন্দোই' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। ফলে গ্রিকরাও খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'হিন্দু' শব্দটির রূপ সম্বন্ধে জানতেন। বিহ্রু বাইবেল 'হুড' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। ১০০ খ্রিস্টপূর্বে চীনারা হিন্দু শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন 'হিয়েন-টু' রূপে। 'স্যার মনিয়ার উইলিয়ামসের সংস্কৃত অভিধানে সংস্কৃত 'হিন্দ' শব্দের ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে 'হিন্দু' শব্দ দিয়ে এবং সেই একই জায়গায় একটি মতামত দেওয়া হয়েছে যে শব্দটির আরও সঠিক অনুবাদ করতে গেলে 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহার করা উচিত। মূল অনুনাসিকটিকে ইংরেজি 'এন' অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। শেষে স্থিত 'ইউ' অক্ষরটি একটি অতিরিক্ত মৃদু অনুনাসিকের অবতারণা করে, যার উপস্থিতি কৌতূহল ও প্রশ্ন দুইয়েরই উদ্রেক করে। সিন্ধু শব্দের শেষে কোনো অনুনাসিকের উপস্থিতি নেই এবং সেইরকম কথা কেউ কখনও উল্লেখ করেছেন বলে জানা যায় না। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর লেখা 'হিন্দুইজম' নামক বইয়ে স্যার মনিয়ার উইলিয়াম 'হিন্দু' শব্দের পরিবর্তে 'হিন্দি' শব্দ ব্যবহার করাই সমীচীন বলে মনে করেছেন।'

'স্যার মনিয়ার উইলিয়াম তাঁর সুবিখ্যাত 'হিন্দুইজম' গ্রন্থের প্রথম পাতায় জানিয়েছেন যে পারস্য দেশের অধিবাসীরা সিন্ধুকে 'হিন্ধু' বলে উচ্চারণ করতো। গ্রিকরা আনুমানিক ভাবে পারস্য থেকে এদেশ সম্বন্ধে জানতে পেয়েছিল। গ্রিকদের উচ্চারণে 'হ' অক্ষরটি পরিত্যক্ত হয় এবং ইন্দোই নামক শব্দটি অবতারণা হয়'।

সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত ও সম্পাদিত 'বাংলা ভাষার অভিধান' নামক অভিধান থেকে হিন্দু শব্দের যে অর্থ পাওয়া যায় তাহলো এরূপ : 'বেদ, পুরাণ স্মৃতি ও তন্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মাচারী ভারতীয় আর্যজাতি হিব্রুত ভাষায় ভারতবর্ষের নাম হন্দ = গৌরবান্বিত রাজ্য। জেন্দ্ ভাষায় হিন্দব, গ্রিক্ ভাষায় হন্দকোশ, ইন্দিকোস্ Indikos, ইন্ডিওস্ Indios, জেন্দ 'হনদ' গৌরবান্বিত রাজ্য, এই রাজ্যের বা দেশের অধিবাসী হনদু বা হিন্দু। পস্তু ভাষায় ভারতকে হনদ বলে, সুতরাং হিন্দ্-এর অধিবাসী হিন্দু। অথবা সিন্ধু-নদী বিধৌত দেশ সিন্ধু বা হিন্দুস্তান। ব্যাপকার্থে সনাতনী, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম, ভারতের বাইরে ব্যাপকার্থে মার্কিন প্রভৃতি দেশে হিন্দুস্থান অর্থাৎ ভারতের অধিবাসী মাত্রই হিন্দু— তদনুসারে ভারতীয় মুসলমানও হিন্দু নামে প্রখ্যাত। শোনা যায়, ভারত হতে যে সকল মুসলমান আরব দেশ হজ করিতে যান, তাদেরও এই দেশের লোকরা হিন্দু বলিয়া থাকে।'

যে পারস্যদের 'স' উচ্চারণের সমস্যার জন্য 'হ' উদ্ভব ফলত সিন্ধু অপভ্রংশ হয়ে 'হিন্দু' শব্দের জন্ম এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য করা যায় না। যেখানে পারস্যের অধিবাসীরা বহু আগেই ভারতবর্ষের অধিবাসীকে হিন্দু বলে সম্বোধন করে এসেছে। ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দু সিভিলাইজেশন' গ্রন্থে ভারতের ভৌগোলিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের বর্ণনা প্রসঙ্গে যথার্থই ব্যক্ত করেছেন, ''The Persians had already defined India as land of the Hindus, Hindusthan. Indeed 'India and Hinduism are organically related as body and soul' (J. Ramsay Macdonald)"

সুতরাং হিন্দু শব্দটি কোনো বহিরাগতদের দেওয়া নামকরণ নয়। এই শব্দটি পৃথিবীতে প্রচলিত বহু প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে এসেছে, ফলে হিন্দু শব্দটির অর্থ ভারতবর্ষের জাতিগত পরিচয়ের বাহক রূপে পরিব্যাপ্ত। মিথ্যার আশু অবসান হওয়া দরকার। ভারতবাসীর সঙ্গে তাঁর ধার্মিক, ভৌগোলিক, সামাজিক ও জাতিগত অর্থে হিন্দু শব্দ স্মরণাতীতকাল থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ◻

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের বৈঠক

গত ৪,৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের প্রদেশ কার্যকারিণীর বৈঠক

অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার ফুলবাগান মাহিষ্য সমিতির সভাগৃহে। রাজ্যের ২১টি জেলার শতাধিক শিক্ষক প্রতিনিধি বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠন বিস্তার, আন্দোলনের স্বরূপ, শিক্ষকদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্য ও সমাধান বিষয়ে আলোচনা হয়। সংগঠনে বিভিন্ন সেল গঠন করে কাজের বিভাজনের পরিকল্পনা করা হয়। মিডিয়া টোলির মাধ্যমে প্রচার কীভাবে বাড়ানো যায় সেবিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর। আগামীদিনে সংগঠনকে কীভাবে ব্লক ও স্কুল থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত মজবুত করা যায় তার পথনির্দেশ করেন। শিক্ষকদের বেতন, ডিএ বঞ্চনা দূর করতে আবারও রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার পরিকল্পনা করা হয়। শ্রীকাপুর সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষকদের বিকল্প সংগঠন হিসেবে এই সংগঠনের গুরুত্ব এরাজ্যে দিন দিন বাড়ছে তা সদস্য বৃদ্ধি থেকে অনুধাবন করা যাচ্ছে।

সিউড়িতে শ্রদ্ধার দ্বাদশতম বার্ষিক অনুভবী সম্মেলন

গত ৫ ফেব্রুয়ারি সিউড়ির অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরে শ্রদ্ধার দ্বাদশতম বার্ষিক অনুভবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শঙ্খধ্বনি, ওঙ্কারধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের ভূতপূর্ব জেনারেল ম্যানেজার পুলক সিনহা। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পূর্বতন জেলা বিচারপতি। উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারতীয় ডাক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিটেনডেন্ট আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ দে।

বৈঠকে নতুন সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি--- মহাদেব মুখোপাধ্যায়। সহ সভাপতি— আগমানন্দ মুখোপাধ্যায় ও জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক— শ্রীদামোদর ঘোষাল। কোষাধ্যক্ষ— বিশ্বনাথ দে। এছাড়াও দশজন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়। প্রাস্তাবিক ভাষণ রাখেন বিশ্বনাথ দে। কয়েকজন অনুভবী তাঁদের অনুভব বর্ণনা করেন। সংগীত পরিবেশন করেন অলকা গাঙ্গুলি ও কাকলি দাস। রাষ্ট্রবন্দনার পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভা পরিচালনা করেন বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

ফঃ ৫

মল্লারপুরে কল্যাণ আশ্রমের নারীশক্তি জাগরণ দিবস উদ্‌যাপন

গত ৭ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা সংগ্রামী নাগারানি গাইদিনলুর জন্মদিনে নারীশক্তি জাগরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বীরভূম জেলার মল্লারপুরস্থিত পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এক শোভাযাত্রায় দু'হাজার বনবাসী মা-বোন তাঁদের পরম্পরাগত পোশাকে মল্লারপুর নগরে নিমিতলা আশ্রম থেকে মল্লারপুর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কল্যাণ আশ্রমের ছাত্রাবাসের মূল অনুষ্ঠানস্থলে পৌছান। উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত গুরুমা কমলিনী সোরেন। অনুষ্ঠানের শেষে সকলেই সহভোজে অংশগ্রহণ করেন।

সিউড়ি অরবিন্দপল্লী শিশুমন্দিরে নিরঞ্জন হালদার স্মৃতি তর্পণ

বীরভূম জেলার সিউড়ি শহরে অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরে গত ৫ ফেব্রুয়ারি স্বর্গীয় নিরঞ্জন হালদার স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে নিরঞ্জন হালদার স্মৃতি তর্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুরুতে গীতাপাঠ করেন ড. দেবাশিস কর্মকার। বিভিন্ন বক্তা স্বর্গীয় নিরঞ্জন হালদারের কর্ম ও জীবনের উপর আলোকপাত করেন। স্মৃতিরক্ষা সমিতি এদিন বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। সিউড়ি শহরের চারটি শিশুমন্দিরের শিশুদের হাতে পুরস্কার প্রদানের জন্য দুই হাজার করে দান করে। দিব্যাঙ্গ জগন্নাথ মাহারাকে দেওয়া হয় দুইহাজার টাকা। কল্যাণ আশ্রমে একটি শিশুর খরচের জন্য পাঁচহাজার টাকা, সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধাকে দুই হাজার টাকা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য। শান্তিমন্ত্র উচ্চরণ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সক্ষমের উদ্যোগে দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি সক্ষম উত্তরবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে এবং রানিনগর বিএসএফ ৪০ ব্যাটালিয়নের সহযোগিতায় জলপাইগুড়ির মাসকলাই বাড়ি আর আর প্রাথমিক বিদ্যালয়র মাঠে দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেদের নিয়ে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মোট ৬০ জন দিব্যাঙ্গ ভাই-বোন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ৫০ মিটার ও ১০০ মিটার দৌড়-সহ কমলালেবু রেস, শর্টপুট ইত্যাদি ইভেন্ট ছিল। প্রতিযোগীদের মায়েরা মিউজিক্যাল চেয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন বিএসএফের ৪০ ব্যাটালিয়ন রানিনগর কম্যান্ডান্ট বিজেন্দ্র কুমার কাসানা। এছাড়া বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ কমলেশ বিশ্বাস, ডাঃ দেবাংশু দাস, সক্ষম উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক চন্দন রায়, সভাপতি তনয়কান্তি দাস, কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার গুহ, কার্যালয় প্রমুখ আশিস দেব দাস, সক্ষমের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ, চা-বাগান ইউনিয়নের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী এবং রোটারি ক্লাবের করলা ভ্যালি শাখার সভাপতি উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সহায়তা করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রত্যেক প্রতিযোগীকে যাতায়াতের ভাড়া দেওয়া হয় এবং মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের জন্য ছিল মেডেল ও ট্রফির ব্যবস্থা। কুষ্ঠমুক্ত ভারত অভিযান ছিল এই উদ্যোগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ত্রিপুরা জনজাতি শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে নাগরিক সম্মান অনুষ্ঠান

ত্রিপুরা জনজাতি শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে গত ৭ ফেব্রুয়ারি তেলিয়ামুড়া হরি রাধা বিদ্যামন্দিরে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বিক্রম বাহাদুর জামাতিয়াকে এক বিশেষ নাগরিক সম্মানে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা জনজাতি শিক্ষা সমিতির সহ সভাপতি ডাঃ মধুসূদন মুরাসিংহ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর ময়ালের দুই বিশিষ্ট সর্দার রাধামানিক জামাতিয়া এবং সূর্যসিংহ জামাতিয়া। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বিনঞ্জয় রিয়াং অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। বিক্রম বাহাদুর জামাতিয়া তাঁর বক্তব্যে বলেন, আগামী প্রজন্মের জন্য জনজাতি ধর্ম, সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য আমাদের সকলকে সংগঠিত হতে হবে। শেষে ড. মধুসূদন সিংহ মুরার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর অনুষ্ঠনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য রাহুল গান্ধীর মনোবেদনা

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পদযাত্রা করে 'ভারত জোড়ো' যাত্রা সমাপ্ত করেছেন। সেখানে তিনি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিরাপত্তার দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছেন। উপত্যকায় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বারবার টার্গেট কিলিঙের শিকার হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মোদীকে লেখা চিঠিতে রাহুল গান্ধী জানান, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর দ্রুত সমাধান জরুরি। তিনি আরও বলেছেন, উপত্যকার পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মানুষের ক্ষেত্রে কাশ্মীর প্রশাসন অসংবেদনশীল। উপত্যকায় ভয় ও হতাশার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে যেভাবে কাশ্মীরি পণ্ডিত ও ভিন রাজ্যের মানুষ জঙ্গি টার্গেট হচ্ছেন, তাতে উদ্বেগের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। তিনি চিঠিতে আরও লিখেছেন, 'ভারত জোড়ো যাত্রার সময় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের একটি প্রতিনিধিদল আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দুঃখের কথা জানায়।'

পরিস্থিতির উন্নতি এবং স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই কাশ্মীরি পণ্ডিত কর্মচারীদের অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন— 'আমি আমাদের কাশ্মীরি পণ্ডিত ভাই-বোনেদের ভরসা দিয়েছি। তাঁদের চিন্তা ও আতঙ্কের কথা আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়ার সবরকম চেষ্টা করব।'

সংবাদপত্রে রাহুলগান্ধীর এই বিবৃতি পাঠ করার পর স্বাভাবিক ভাবেই সমাজের কিছু ঠোঁটকাটা লোক বলা শুরু করেছেন যে গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের প্রথমেই রাহুল গান্ধী জওহরলাল নেহরুর বন্ধু, শেখ আব্দুল্লার পুত্র ফারুক আব্দুল্লার মদতে হাজারে হাজারে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা হত, আহত, ধর্ষিত, নির্যাতিত এবং সর্বস্বান্ত হয়ে কাশ্মীর থেকে পালিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে মনুষ্যেতর জীবনযাপন করলেও রাহুল গান্ধী কোনোদিন তাঁদের কথা মনে স্থান দেননি। এমনকী ২০০৪ থেকে ২০১৪ দশ বছর কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকলেও রাহুল গান্ধী এই সমস্ত হতভাগ্য পণ্ডিতদের সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি। তাছাড়া ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধী কপালে তিলক এঁকে দত্তাত্রেয় ব্রাহ্মণ সেজে কাশ্মীর চষে বেড়িয়েছেন এবং অমরনাথেও গিয়েছেন পুজো দিতে। তবুও একবারের জন্যও তিনি সেখানকার পণ্ডিতদের জন্য ব্যথা অনুভব করেননি। কারণ সে সময় কাশ্মীরের ঘটনা বহু মানুষ জানতেন না। কিন্তু বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস্' সিনেমা সারা দেশের মানুষের সামনে পণ্ডিতদের দুরবস্থার করুণ চিত্র তুলে ধরেছে। তাই চব্বিশের ভোটকে সামনে রেখে তিনি এবার পণ্ডিতদের এবং হিন্দু সমাজের মন জয় করার জন্য কাতর হয়ে পড়েছেন।

এদিকে সাধারণ মানুষ বলছেন, রাহুল গান্ধী কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পদযাত্রাকে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' শব্দবন্ধ ব্যবহার করলেন কেন? বর্তমান দিনে ভারত নামক দেশটি কী ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? সে রকম তো কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না? বরং নেহরু ও জিন্না মিলিতভাবে দেশ ভাগ করেছিলেন এবং কাশ্মীরের কিছু অংশ যুদ্ধের সময় ভণ্ডামি করে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যা পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) নামে পরিচিত। সেই 'পক'-এর জনসাধারণ এখন পাকিস্তানের হাত থেকে বেরিয়ে এসে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইছে। ওদিকে বালুচিস্তানের জনগণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপ দাবি করছেন। এহেন পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধী ভারতের কোন অংশে ফাটল ধরার সম্ভাবনা দেখে 'ভারত জোড়ো' কর্মসূচি নিয়েছেন? এর কারণই-বা কী?

নিন্দুকেরা বলছেন, কারণ তো একটা আছেই। আর সে কারণটা হলো ২০১৪ সালে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গড়ার পর থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং রূপায়ণের কারণে দেশবাসী প্রধানমন্ত্রীর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেছে। যার ফলস্বরূপ ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য বিজেপি আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায় এমপি নিয়ে সরকার গঠন করে উন্নয়ন নামক অশ্বমেধের ঘোড়া ভারতব্যাপী ছুটিয়ে চলেছেন। তার ফলে বিজেপি বিরোধীদলগুলির রাজনীতির বাজারে বেচা-কেনা বন্ধ হওয়ার জোগাড়। কিন্তু রাজনীতিকরা তো কেউ কাউকে ফাঁকা মাঠে গোল দিতে দেবেন না। তাই জনতার মন ভুলানোর জন্য রাহুল গান্ধী 'ভারত

জোড়ো'পদযাত্রা করলেন। যেমন কয়েকদিন আগে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনে ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড প্রভৃতি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোট প্রচারের উদ্দেশে মেঘালয়ে গিয়ে মুরগির পালক মাথায় গুঁজে কিম্ভূতকিমাকার সাজ সেজে কা-কু-কু-উউ ডাক ছেড়ে নাটক করে রাজ্যের মানুষকে আনন্দ দিয়ে এসেছেন।

২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের পর রাহুল গান্ধী বুঝেছিলেন যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে শুধুমাত্র মুসলমানদের পায়ে তেল মালিশ করে এখন আর গদি দখল করা যাবে না। কেননা হিন্দুদের ঘুম ভাঙা শুরু হয়েছে। তখন থেকে ২০১৯-এর ভোট পর্যন্ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন হিন্দু হওয়ার জন্য। কখনও কপালে তিলক এঁকে, কখনও-বা নিজেকে দত্তাত্রেয় ব্রাহ্মণ বলে, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিয়ে ভোটের প্রচার করেছেন। কিন্তু ভারতবাসী তাঁর নাটককে মুগ্ধ হননি। বরং দেশবাসী আরও বেশি করে নরেন্দ্র মোদীর হাত শক্ত করেছেন। শুধু রাহুল গান্ধীর কথাই-বা বলি কেন। সিপিএম নেতারা মহান আল্লার বন্দনা ছেড়ে রামনাম সম্বল করেছিলেন। আগামী ২০২৪ সালের ভোট পর্যন্ত এঁনারা নতুন কিছু ভড়ং ভারতবাসীকে দেখাবেন কিনা এখনও জানা যাচ্ছে না। তার নতুন কিছু দেখা অবশ্যই যাবে। রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো পদযাত্রা এবং কাশ্মীরি পণ্ডিতদের জন্য কান্না যে ২০২৪-কে সামনে রেখেই তা হলফ করে বলা যায়।

রাহুল গান্ধী কাশ্মীরে কেন তাঁর পদযাত্রা শেষ করলেন তারও হয়তো গূঢ় কারণ আছে। গান্ধীজী আর ব্রিটিশের বন্ধু জওহরলাল নেহরু দেশকে চোরা বালিতে ডোবার ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। দেশ ডুবতে ডুবতে গলা পর্যন্ত চোরাবালিতে সেঁধিয়ে গিয়েছিল। দেশের উন্নতি ও প্রগতির চিন্তা দূরে সরে গিয়েছেন। এমমাত্র কাশ্মীর সমস্যাই শাসক কুলকে সরষেফুল দেখিয়ে ছেড়ে ছিল। ভারতের সর্বনাশের মূল যেমন নেহরু পরিবার, কাশ্মীরে ভারতের নাকানিচোবানি খাবার মূল কারণও শেখ আব্দুল্লার পরিবার। এই দুটি পরিবারের অবৈধ ও অশুভ যোগাযোগেই কাশ্মীর ক্যান্সারের রূপ ধারণ করে আর্থিক দিক থেকে দেশকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছিল। ধনে জনে মারা যাচ্ছিল হিন্দুরা। কাশ্মীরে হাজার হাজার হিন্দু পণ্ডিত হত্যা এবং লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ভিটেছাড়া করেছে অশুভ শক্তির প্রতীক শেখ আব্দুল্লার পুত্র ফারুক আব্দুল্লা। অথচ অপরিমিত টাকা ঢালা হচ্ছিল কাশ্মীরে বছরের পর বছর ধরে। এ যেন নিজের শরীরের মাংস কেটে হিংস্র বাঘকে খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে তোলা যাতে সে ভালো করে ঘাড় মটকাবার শক্তি অর্জন করতে পারে। কিন্তু দেশবাসীর আশীর্বাদে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় বসেই গলায় ঝুলন্ত কাশ্মীর নামক এলবার্ট পাখিকে গলা থেকে টেনে নামিয়ে মাটিতে চেপে দেওয়াতে দেশীয় সেকুলাররা আর্তনাদ শুরু করেছে। কিন্তু অকুতোভয় নরেন্দ্র মোদী তাতে দমে তো যানইনি বরং হুংকার ছেড়ে বলেছেন, সাহস থাকলে বিরোধীরা ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা ফিরিয়ে আনুন। একেই বলে ৫৬ ইঞ্চি বুকের পাটা।

সম্প্রতি 'মর্নিং কনসাল্ট' নামে একটি মার্কিন সংস্থা জানিয়েছে, সমীক্ষায় ৭৮ শতাংশ সমর্থন পেয়ে বিশ্বের সব থেকে জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এহেন বিশ্বনেতা তথা সন্ন্যাসী রাজা যখন সুমহান ভারতের হাল ধরে রয়েছেন তখন দেশবাসীও নিশ্চিন্তে তাঁর ওপর পূর্ণ ভরসা রেখেছে। যাদের পূর্বপুরুষরা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করেও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজকে পদে পদে পদদলিত করে রাখার ব্যবস্থা করে গেছে এবং যাদের হাতে শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে শিখ, হিন্দুর রক্তের দাগ লেগে আছে তাদের উত্তরসূরিদের কাশ্মীরি পণ্ডিত বা দেশের হিন্দু সমাজকে নিয়ে বেশি চিন্তা না করলেও চলবে। তবে ভোটের লক্ষ্যে হিন্দু বা অমুসলমানদের নিয়ে যারা চিন্তা করছে তাদের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটা কথা ধার করে বলতে হচ্ছে— 'তাদের চৈতন্য হোক।' □

নবাঙ্কুর

খাঁচার বাইরে খাঁচার জন্তু

বনের জন্তুকে ধরে যখন খাঁচায় পোরা হয় তখন তার যে কীরকম অবস্থা হয়, সেটা বেশ সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু খাঁচার জন্তু যখন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে পড়ে তখন তার দুরবস্থাটিও এক-এক সময় বড়ো কম হয় না।

লন্ডনের এক চিড়িয়াখানায় একটা রেলিং দেওয়া বাগান-করা জমির মধ্যে কতগুলি হরিণ থাকত। সেই ছোট্টো জমিটুকুর মধ্যে নতুন ঘর তৈরি হবে, তাই মজুরেরা সেখানে কাঠের তক্তা এনে ফেলেছিল। একদিন একটা হরিণ সেই রাশি করা কাঠের উপর চড়ে হঠাৎ কেমন করে এক লাফ দিয়ে রেলিঙের বাইরে গিয়ে পড়েছে। হরিণ পালাচ্ছে দেখে চিড়িয়াখানার লোকেরা সব ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল, কিন্তু হরিণ বেচারা ব্যস্ত হলো তাদের চাইতেও অনেখানি বেশি। যখন সে বুঝতে পারল যে রেলিঙের মধ্যে ফিরে যাবার আর কোনো উপায় নেই, তখন সে কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে পাগলের মতো চিড়িয়াখানার বাগানময় কেবল ছুটোছুটি করতে করতে লাগল। হরিণের দৌড় দেখে বাগানের যত জন্তু সবাই যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাঘ সিংহ উঠে দাঁড়াল। হরিণেরা বড়ো-বড়ো চোখ মেলে যে-যার ঘরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। আর বাঁদরগুলো রেলিঙে চোখ ঠেকিয়ে চেঁচাতে লাগল আর রেলিং ধরে ঝাঁকাতে লাগল। অনেক হাঙ্গামার পর, শেষটায় সেই ঘেরা জমির দরজাটা খুলে দিয়ে হরিণটাকে সেইদিকে তাড়া করতে তখন সে নিজের পরিচিত আশ্রয়ে ঢুকে তারপর শান্ত হলো।

এক টিয়াপাখির গল্প পড়েছিলাম। এক বাজিওয়ালার কাছে সে নানারকম বোলচাল শিখেছিল। যখন তামাশা দেখবার জন্য দলে-দলে লোক এসে বাজিওয়ালার তাঁবুর ধারে ভিড় করত আর ঢুকবার জন্য ঠেলাঠেলি করত, তখন টিয়াপাখিটা চিৎকার করে বলত — 'আস্তে! আস্তে! ঢের জায়গা আছে! মশায়রা ভিড় করবেন না।' একদিন টিয়াপাখির কী দুর্মতি হলো, খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে সে উড়ে পালাল। কিন্তু পালাবে আর কোথায়? একে তো বেচারার উড়বার অভ্যাস নেই, তার উপর খাঁচায় থেকে খাঁচাটার উপরেও কেমন মায়া হয়ে গেছে। তাই দু'একদিন এদিক-ওদিক লুকিয়ে থেকে সে আবার ঘুরে ফিরে সেই তাঁবুর কাছেই একটা গাছে এসে বসল। এদিকে বাজিওয়ালা খুঁজে খুঁজে তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। এমন সময়ে ভারী একটা হইচই গোলমাল শুনে বাজিওয়ালা বেরিয়ে এসে দেখল, গাছের উপর টিয়াপাখি বসে আছে আর যত রাজ্যের পাখি এসে তার চারদিকে গোলমাল করে, তাকে ঠুকরিয়ে আর পালক ছিঁড়ে অস্থির করে তুলেছে। টিয়াপাখি বেচারা ব্যাপার দেখে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, আর বলে চলেছে—'আস্তে! আস্তে! ঢের জায়গা আছে। মশায়রা ভিড় করবেন না।' তখন বাজিওয়ালা খাঁচাটা এনে খুলে ধরতেই বেচারা তাড়াতাড়ি তার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পাখি বা হরিণ বা কোনো নিরীহ জন্তু না হয়ে যদি বাঘ বা সিংহের মতো হিংস্র জন্তু এইরকমভাবে ছাড়া পেত, তাহলে ব্যাপারটা কীরকম হতো? হাঙ্গরির বুদাপেস্ত শহরে একবার একটা সিংহ সার্কাসওয়ালার খাঁচা থেকে কেমন করে বেরিয়ে পড়েছিল। সিংহ বেরিয়ে পড়েছে দেখে সার্কাসের লোকেরা হইচই করে গোলমাল করে উঠতেই সিংহ বেচারা থতমত খেয়ে একেবারে সার্কাসের জমি পার হয়ে সড়ক পার হয়ে পাঁচিল টপকিয়ে এক খোলা ময়দানের মধ্যে গিয়ে হাজির। সেটা ছিল ছেলেদের খেলার মাঠ— তারা সেখানে বল খেলছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে, হুড়োহুড়ি করছে। সিংহ বেচারার তো চক্ষুস্থির, সে এরকম কাণ্ড আর কখনো দেখেনি। কোথায় আর যায়, সে অপ্রস্তুত হয়ে চুপচাপ সরে পড়বার চেষ্টা করছে এমন সময় পাঁচিল টপকিয়ে সিংহওয়ালা স্বয়ং এসে হাজির। সিংহ তখন ভিড়ের মধ্যে চেনা মুখ দেখে আশ্বস্ত হলো, আর পোষা বেড়ালটির মতো তার মালিকের সঙ্গে আস্তে আস্তে খাঁচায় ফিরে চলল।

আর একবার আমেরিকার এক সাহেবের পোষা সিংহ খাঁচা থেকে পালিয়েছিল। শহরের রাস্তায় বেরিয়েই সে দেখে চারদিকে লোকজন, গাড়িঘোড়া চলাচল করছে, নিরিবিলি বসবার জায়গা কোথাও নেই। তাই দেখে পশুরাজের মেজাজ গেল বিগড়ে। সে একটা ড্রেনের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। কুকর লেলিয়ে, বন্দুক ছুটিয়ে, নানারকম খোঁচাখুঁচি করেও তাকে বের করা গেল না। এমন সময়ে কার হাত থেকে একটি টিনের বালতি ঝনঝন করে ড্রেনের মধ্যে পড়ে যায়। সেই শব্দ শুনে চমকে উঠে পশুরাজ এক দৌড়ে একেবারে তার খাঁচার মধ্যে! কারণ খাঁচার মতো নিরাপদ জায়গা আর নেই।

শ্যামল চক্রবর্তী

ভারতের বিপ্লবী

লীলা নাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী হিসেবে অমর হয়ে আছেন। ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর অসমের গোয়ালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। নারী শিক্ষা প্রসারে এবং মেয়েদের রাজনীতি সচেতন করে তুলতে সুভাষচন্দ্র বসুর সহকারিণী হিসেবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। দীপালী সঙ্ঘ নামে নারীসমিতি গঠন করেছিলেন। ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'নারীশিক্ষা মন্দির' নামে বিদ্যালয়। মেয়েদের সমাজ ও দেশের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে ১৯৩৯ সালে 'জয়শ্রী' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বামী অনিল রায়ের যোগ্য সহধর্মিণী হিসেবে শ্রীসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশের স্বাধীলতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৭০ সালের ১১ জুন তিনি পরলোকগমন করেন।

জানো কি?

—ভগবান বিষ্ণুর রথের নাম গরুড়ধ্বজ।

— বিষ্ণুর গদার নাম কৌমদকী।

— বিষ্ণুর ধনুকের নাম সারঙ্গ।

--- মহাদেবের ধনুকের নাম পিনাক।

--- মহাদেবের রথের নাম ত্রিপুরজিৎ।

--- শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য।

— ইন্দ্রের সারথির নাম মাতলি।

— অর্জুনের রথের নাম কপিধ্বজ।

ভালো কথা

ঘুঘুছানা

কাকের মুখ থেকে একটি ঘুঘুছানা আমাদের বাড়িতে খড়ের গাদার উপর পড়ে যায়। এতই ছোটো যে ছানাটির চোখও ফোটেনি। সারা গায়ে রেশমের মতো পালক। মা ছানাটিকে তুলে নিয়ে কাপড়ের উপরে রেখে ঠোঁট ফাঁক করে একটু একটু করে ডালবাটা খাইয়ে দিয়েছিল। দুদিন পরেই ছানাটির চোখ ফোটে। চিঁ চিঁ করে মাকে ডাকত। ধীরে ধীরে ছানাটি বড়ো হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু মাকে ছেড়ে কোথাও যায় না। এখন উড়তে শিখেছে। তবু সবসময় মায়ের কাছেই থাকে। মায়ের গায়ে মাথায় বসে। আমাদের লালু ও পুশি ওর সঙ্গে খেলা করে। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে কিন্তু আমার গায়ে বসে না। মা ছাড়া কারও গায়ে বসে না। মাকে দেখতে না পেলে ঘু ঘু উ বলে ডাকে।

শীলা হাঁসদা, সপ্তম শ্রেণী, কোটশিলা, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) চা চি না

(২) গি নে রি

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ন ম বি ক্র র্ত ব

(২) খ খ রা র ব ব

৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) চলনসই (২) চালকুমড়ো

৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) অকথাকুকথা (২) অখাদ্যকুখাদ্য

উত্তরদাতার নাম

(১) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, ই ৱি, মালদা। (২) আদিত্য চৌধুরী, রাজনগর, কালিয়াচক, মালদা। (৩) দেবরূপা কর্মকার, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪। (৪) সুপ্রতীম রায়, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

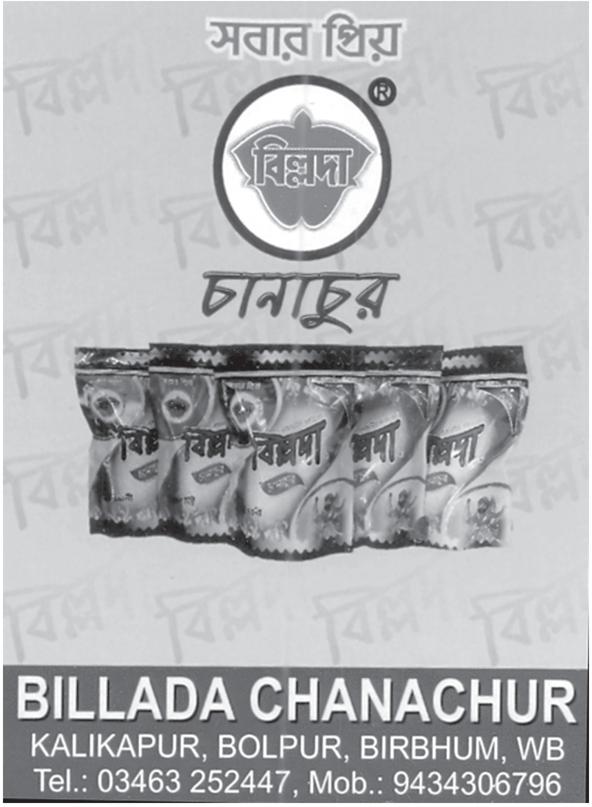

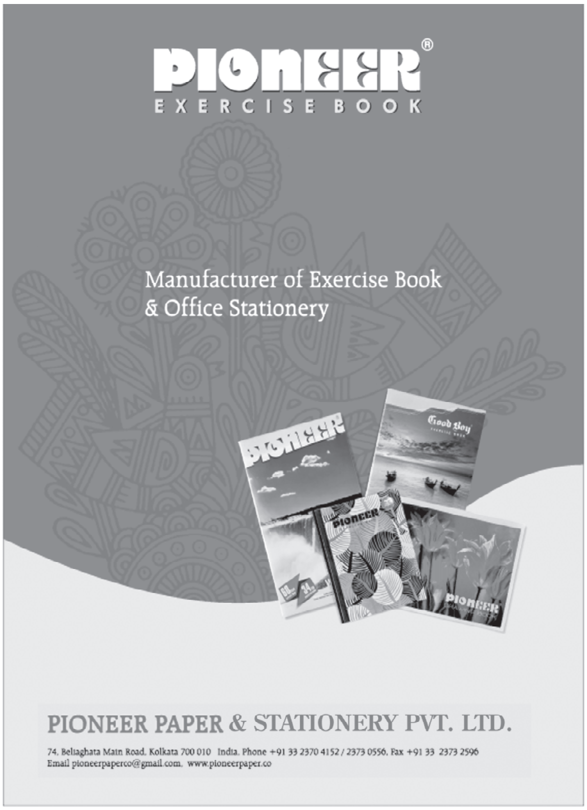

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বাঙ্গালি না বুঝলে বাংলা ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি পাবে না

দেবলীনা চৌধুরী

বাংলা ভাষা হলো বাঙ্গালির প্রাণের ভাষা। বিশ্বজোড়া এর স্বীকৃতি। এমন সুমিষ্ট, সমৃদ্ধ ভাষা বিশ্বের ভাষার ইতিহাসে অবশ্যই বিশেষ স্থানের অধিকারী। যে কারণে কবি অতুলপ্রসাদ সেন খুব সদর্থক ভাবেই বলেছেন— ‘মোদের গরব, মোদের আশা/আ মরি বাংলা ভাষা’। সারা বিশ্বে এর পরিচিতি জনপ্রিয়তার নিরিখে তো বটেই, এক দীর্ঘ ইতিহাসের ভিত্তিতেও বটে। কিন্তু খুব অদ্ভুতভাবে ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষার তালিকায় এর ঠাঁই মেলেনি। আর ঠিক এই কারণেই শুরু থেকে বাঙ্গালি মননে জমেছে ক্ষোভ, উঠেছে বিতর্ক। টিভির পর্দায়, রেডিয়োতে, খবরের কাগজে বা ম্যাগাজিনের পাতায় চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্তপ্ত আলোচনা। তাতেও কোনো উত্তর মেলেনি, সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। এতগুলো ভাষা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেল, তবে বাংলা কেন নয়? এই প্রশ্নের যথাযথ ব্যাখ্যা না পেয়ে বিক্ষুব্ধ অনেক বাঙ্গালিই রচনা করেছেন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। অর্থাৎ কেন্দ্রের চক্রান্তেই বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালি জাতি বঞ্চিত। এই ধরনের তত্ত্বের সমস্যা হলো, এতে দোষারোপের সুযোগ প্রচুর আর নিজের উপর থেকে দায়টাও পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলা যায়। যেখানে দায়িত্বই নেই, সেখানে ভাষার জন্য কিছু করার তাগিদটাও আসে না। তবে কঠোর সত্যিটা হলো এই যে, বাঙ্গালি যদি নিজে থেকে উঠে পড়ে না লাগে, তাহলে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা কোনোদিনই আসবে না। এই নিবন্ধের সূত্রপাত ঠিক সেখান থেকেই।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার, ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী কোনো ভারতীয় ভাষার ধ্রুপদী ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রাপ্তির শর্তগুলি নিম্নরূপ :

ফ ঃ ৬

১। ওই ভাষার আদিতম গ্রন্থগুলি সুপ্রাচীন হওয়া প্রয়োজন এবং ওই ভাষা ব্যবহারের ১৫০০ থেকে ২০০০ বছরের নথিবদ্ধ ইতিহাস থাকা বাঞ্ছনীয়।

২। ওই ভাষায় একটি প্রাচীন সাহিত্যসম্ভার থাকতে হবে যা সেই ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রজন্মের কাছে মূল্যবান ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩। ওই সাহিত্যসম্ভার মৌলিক হওয়া আবশ্যক, অন্য কোনো ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যের ভাষান্তর এক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়।

৪। ধ্রুপদী হিসেবে বিবেচ্য ওই ভাষা এবং তার সাহিত্য এর আধুনিক রূপের থেকে পৃথক হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

বাংলা ভাষার উদ্ভব নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মূলত আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পূর্বতম শাখা ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে বাংলার উদ্ভব। আদি ভারতীয় আর্য কিংবা সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপন্ন মধ্য ভারতীয় আর্য কিংবা প্রাকৃত— এর বিশেষ একটি উপশাখা কিংবা উপশাখাগুচ্ছ বাংলা ভাষার জননী— এমনটাই একদল বিদগ্ধ ব্যক্তির বক্তব্য। আবার এটাও বলা হয় যে, বাংলা ভাষার বর্তমান রূপটি এখন যে অঞ্চল জুড়ে ব্যবহৃত হয়, সেই অঞ্চলটির প্রাচীন নাম ছিল প্রাচ্য অঞ্চল। পূর্বে এখানে আধিপত্য ছিল মাগধী ভাষার। আধুনিক বাংলাভাষা মাগধী ভাষারই একটি বিশিষ্ট শাখা। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে সংস্কৃত ভাষাই আর্যাবর্তে ভদ্রসমাজের একমাত্র ব্যবহার্য ভাষারূপে পরিগণিত হয়েছিল। তার পরে আরও প্রায় দু' হাজার বছর ধরে সংস্কৃত ভাষা শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিল। ভারতবর্ষের উদ্ভব ও বিবর্তনের মূলে সংস্কৃতের প্রভাব ছিল বিশেষভাবে কার্যকর। আদি ভারতীয় ভাষার কথ্য রূপ থেকেই বিকশিত মধ্য ভারতীয় ভাষার সকল ভাষার উদ্ভব একই সময়ে হয়নি। তবে বাংলার মতো কোনো শাখার উদ্ভব দশম শতাব্দীর আগেই হয়েছিল।

পূর্বী আর্য ভাষা থেকে নির্গত হয়ে বাংলা ভাষা যে স্তরগুলির মধ্য দিয়ে এসেছে, তাকে আদ্য ও মধ্য— এই দুটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। বর্তমানকালে এর আধুনিক পর্ব। আনুমানিক ৯৫০ থেকে ১৩৫০ পর্যন্ত এর আদি পর্ব হিসেবে চিহ্নিত। আনুমানিক ১৩৫০ থেকে ১৭৫০ পর্যন্ত এর মধ্য পর্ব। এরপর ১৮৫০ সাল থেকে এর আধুনিক পর্বের সূত্রপাত। মধ্য বাংলার মধ্যে রয়েছে আবার দুটি পর্ব— (ক) আদ্যমধ্য (১৩৫০-১৫৫০) এবং অন্ত্যমধ্য (১৫৫০-১৭৫০)। সমাপিকা ক্রিয়াপদে একবচন ও বহুবচনের পার্থক্য লোপ, যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার বৃদ্ধি ফার্সি শব্দের আমদানি— প্রভৃতি বিষয়গুলি আদিমধ্য ও অন্ত্যমধ্যের তুলনায় উঠে আসে।

আদি পর্বের বাংলাভাষার একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদগুলি গানের জন্যই রচিত। এখানে কবি লুইপা, কাহ্নপা, ভুসুকুপা ইত্যাদি বহু পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। এই গান, অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত ছত্র, অমরকোষের টীকায় সর্বানন্দের সংকলিত শব্দ থেকে অনুমান করা যায় যে, বাংলা ভাষার বয়স মোটামুটি দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী। চর্যাগানের রচনা অনেকাংশেই কথ্য ভাষাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। ভাষা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গীয়। কিন্তু অন্যান্য উপভাষারও প্রভাব এতে রয়েছে। মধ্য বাংলার সাহিত্যিক রূপ পশ্চিমবঙ্গের ভাষাকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছিল। যেহেতু সেই সময়কার বাংলার সাহিত্যিক রূপের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যিকদের অবদান ছিল, সেই কারণে বাংলার বিভিন্ন উপভাষার প্রভাব এর মধ্যে দেখা যায়। এছাড়াও প্রচুর সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এই সময়ে লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণে বাংলা ভাষার দৃঢ়তাও বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও ছিল ব্রজবুলির ব্যবহার। বাংলা ও ব্রজবুলির মিশ্রণ তৎকালীন বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষিত।

মুঘল আমলে আবার বাংলা ভাষায় ফার্সি শব্দের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। সরকারি ভাষা হিসেবে ফার্সির স্বীকৃতিও এই সময় দেখতে পাওয়া যায়। ফলে ফার্সির ব্যবহারও বেড়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ আবির্ভাবের পূর্বকাল পর্যন্ত ফার্সির একাধিপত্য দেখা যায়। এরপর বাংলার ওপর ইংরেজির প্রভাব শুরু হয়। এরপর ষোড়শ- সপ্তদশ শতাব্দীতে নানান পর্তুগিজ শব্দ স্থান পায় বাংলা শব্দভাণ্ডারে। তবে পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার ওপর ইংরেজি ভাষার প্রভাবই বেশিমাত্রায় দেখতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাংলার চারটি আঞ্চলিক রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা, (খ) উত্তরবঙ্গের উপভাষা, (গ) উত্তর-পূর্ববঙ্গের উপভাষা, (ঘ) পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ভাষা। অন্যদিকে আধুনিক বাংলার দুটি রূপ— সাধু ও চলিত। মধ্য বাংলা পর্বে শিক্ষিত ব্যক্তির ভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সাধু ভাষা। সাধু ভাষা বাংলা হলেও সংস্কৃতের অনুসারী। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব তাঁর অমর সৃষ্টি 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন সংস্কৃতাশ্রয়ী বাংলায়। অন্যদিকে চলিত ভাষা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক কালের সৃষ্টি, যদিও এই দুই ভাষার পার্থক্য চলিত নয়। সে যাই হোক, পরবর্তী মঙ্গলকাব্যের যুগে বাংলা ভাষার অবয়ব অনেক সহজ-সরল হয়ে ওঠে এবং চলিত কাব্যের প্রচলন বাড়ে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, খেলারাম চক্রবর্তী প্রমুখের প্রচেষ্টায় 'চণ্ডীমঙ্গল', 'অন্নদমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল' প্রভৃতি কালোত্তীর্ণ বাংলা কাব্য রচিত হয়।

এবার আসা যাক বাংলা লিপির উদ্ভব সম্পর্কিত ইতিহাসে। অন্যান্য ভারতীয় লিপিমালার মতোই বাংলা লিপিও অশোকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত ব্রাহ্মী লিপিমালা-জাত। দ্বাদশ শতাব্দীর পর বাংলা লিপির বিকাশ সহজভাবে ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় দুটি ছাঁদের লিপি লক্ষ্য করা যায়— আলংকারিক ও ব্যবহারিক। আধুনিক বাংলা মুদ্রণ লিপির সৃষ্টি ও প্রয়োগ সর্বপ্রথম করেন চার্লস ইউলকিন্স, ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই অক্ষরের কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ঠিক পরেই আসে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। একে একে বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয় বাংলার সাহিত্য জগতে। একটা কথা মাথায় রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কিংবা বিভূতিভূষণের মতন বিরাট মাপের সাহিত্য প্রতিভা কোনো জাতির মধ্যেই পারম্পর্যহীন ভাবে সৃষ্ট হন না। জাতির মধ্যে সাহিত্যের একটা সুনির্দিষ্ট ধারা না থাকলে এই ধরনের যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যিকেরা উঠে আসতে পারেন না। চর্যাপদ থেকে জয়দেব, ভারতচন্দ্র থেকে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম কিংবা সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ, আবার রবীন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রানুসারী সাহিত্যসমাজ— এই সবই হয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট ইতিহাস, সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্য অনুসরণ করে। তাছাড়া এই সুবিশাল কালজয়ী সাহিত্য ভাণ্ডারের জন্ম কোনো একজনের পক্ষে একদিনে সম্ভব ছিল না। ওই বিশ্লেষণ থেকে এটি পূর্ণরূপে স্পষ্ট যে বাংলা যথেষ্ট প্রাচীন একটি ভাষা এবং ধ্রুপদী ভাষা রূপে পরিগণিত হওয়ার সব শর্তই সে পূরণ করে নিজেকে ধ্রুপদী ভাষার তালিকায় যুক্ত করার সফল দাবি রাখে।

এবারে আমাদের করণীয় কী? কোনো ভাষাকে ধ্রুপদী হিসেবে মর্যাদা দানের বিষয়টি বিনা পরিশ্রমে আসে না। বরং সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেই মর্যাদার চাহিদা থাকতে হয়, যে কোনোভাবে সেই চাহিদা পূরণের আকুতি থাকতে হয়। যার জন্য প্রথমেই চাই জনসচেতনতা। বাঙ্গালি জনগণকে প্রথমেই বুঝতে হবে ধ্রুপদী মর্যাদার গুরুত্ব কী এবং সেই মর্যাদা পেলে বাংলা ও বাঙ্গালির লাভ কী হতে পারে? বোঝার দায়িত্ব যেমন সাধারণ বাঙ্গালির, এই সাধারণ বাঙ্গালি সমাজকে বোঝানোর দায়িত্বও বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর। এই সবকিছুর পর রয়েছে যথাযথ জনমত গঠন করে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো। এই পুরো পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ করা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ফলে ওই সংক্রান্ত সরকারি গবেষণা বা তথ্য সংগ্রহের কাজে যেন কোনো ঢিলেমি না চলে আসে, সেটা সুনিশ্চিত করবার দায়িত্ব বাঙ্গালি জনগণের। গণদাবি যদি জোরদার হয়, তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। এক্ষেত্রেও বাঙ্গালির সেই দাবি পূরণের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বাংলা ভাষার মর্যাদা, বাংলা ভাষার যথাযথ স্বীকৃতি।

তথ্যসূত্র :

১। চট্টোপাধ্যায় তপনকুমার, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, মে ২০১০, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা।

২। চট্টোপাধ্যায় হীরেন, 'ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস', পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, শ্রীপঞ্চমী, ১৪১১, এস ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং, কলকাতা।

৩। বন্দোপাধ্যায় অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'— প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৪। সেন সুকুমার, 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, মে ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৫। সেন সুকুমার, 'বাংলার সাহিত্য-ইতিহাস', ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০০৭, সাহিত্য অ্যাকাডেমি, নতুন দিল্লি।

(আন্তর্জাতিক ভাষাদিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

অজস্র মানুষ গড়ে বিদায় নিলেন মানিকদা

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের সকলের মানিকদা, অর্থাৎ মানিকলাল চক্রবর্তী। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে একজন নিখাদ বাঙ্গালি আটপৌরে মানুষ। আচার-আচরণে নম্র, বিনয়ী যেন— তৃণাদপি-সুনীচেন— কোথায় পেলেন এসকলের পাঠ! তিনি ছিলেন আশৈশব সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। ১৯৬০ সালে বিষ্ণুপুরের (গুপ্ত বৃন্দাবন) মাটিতে শাখা (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ) শুরু হলো। প্রথম ধীরে ধীরে স্বয়ংসেবক। সঙ্ঘের শাখা নিত্য সিদ্ধশক্তি। গানে গানে এখানে হৃদয় ভরে। 'এ মাটিতে জন্ম নিয়ে মা বলে জেনেছি যারে/সে মায়ের চরণ ছেড়ে বলরে কেবা থাকতে পারে।' অথবা 'এদেশের মাটি আমার মাথার মণি...'। জীবনের সকালে সাক্ষাৎ হলো মনমোহনদা, বিদ্যুৎদা, অনন্তদার মতো দেবদুর্লভ প্রচারকদের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গত সান্নিধ্য অফুরান প্রাণ পেয়েছেন। মাঠে দক্ষ-আরম্, সমতা-আসন-সূর্য নমস্কার, পরে খেলা। খেলার মধ্যে ম্যায় শিবাজী, বিষ-অমৃত, সঙ্ঘেশক্তি কলৌযুগে। গান- সুভাষিত-অমৃতবচন, শেষে প্রার্থনা। এই সঙ্ঘের নিত্য সাধনা। দেশেপ্রেমের অমৃতধারায় তিনি নিজেকে গড়েছেন, দেশ গড়ার কারিগর হয়েছেন। সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব সময়ে সময়ে পালন করেছেন। শাখা থেকে নগর, মহকুমা ও জেলা। অখণ্ড বাঁকুড়ার জেলা সঙ্ঘচালক ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন অধ্যাপক। বিষ্ণুপুর রামানন্দ মহাবিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপাক। ছাত্রদের মুখে শুনেছি— এরকম শিক্ষক যিনি শিক্ষায়-আচার-আচরণে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিভিন্ন সময়ে শাখায় এবং সার্বিকভাবে সঙ্ঘের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন মানিকদা। মানুষকে সচেতন করার জন্য তাঁর হুংকার শোনা গেল। এজন্য প্রাপ্তি হলো জেল। এযেন স্মরণ করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' সব্যসাচীর কথা— 'সমাজের সকলের মাঝে তোমার থাকা চলিবে না।' দেশ ও সমাজের ইতিহাস জানেন মানিকদা। কোনোভাবেই তিনি নিরস্ত হননি। জীবনে একটা দিনও ছিল না, তিনি সঙ্ঘের প্রার্থনা করেননি। প্রতিদিন নিত্য শাখায় যেতেন। ছোটো ছোটো গল্প বলতেন ভাবী দেশনায়কদের। একটা বৌদ্ধিক তাঁর শ্রীমুখ থেকে শুনেছি— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন' নাটকের অংশ— গিয়াছে দেশ ক্ষতি নাই এবার তোরা মানুষ হ'। এ যেন বিবেকানন্দের অনুরণন 'মানুষ চাই'। মাটি তাঁর সাধনা; সেটাই তিনি জীবন দিয়ে করে দেখিয়েছেন। সঙ্ঘের বিস্তারে কার্যালয় চাই। একটা উপযুক্ত স্থান চয়ন করেছেন। এবার নির্মাণ। মানিকদা জামার আস্তিন গুটিয়ে লেগে পড়েছেন। উদারহস্তে কাজ করেছেন। হয়তো গুনগুন করে গেয়েছেন— 'এদেশের মাটি আমার মাথার মণি।'

প্রতিদিন স্মরণ করেছেন— 'ত্বদীয়ায় কার্যায় বদ্ধা কটীয়ম্'। এত অনুগত মানুষ। পুঁজি করেছিলেন নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। রবীন্দ্রনাথের স্মরণ নিয়ে বলি— নাম মানুষকে জাঁকাইয়া তোলে না মানুষই নামকে জাঁকাইয়া তোলে। অথবা ছোটোবেলায় মা, ঠাকুমার মুখে শুনতাম সাতরাজার ধন এক মানিক। মানিকদা কথাটা উলটে দিয়েছেন— মানিক যিনি সাত রাজার ধন। তাঁর স্থান স্বয়ংসেবকদের হৃদয়মন্দিরে।

গম ও আটার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পদক্ষেপ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন গম খোলা বাজারে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। যা রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, জাতীয় ক্রেতা সমবায় ফেডারেশন (নাফেড), রাজ্য সমবায় এবং ফেডারেশনগুলিকে বিক্রি করা হবে গম ও আটার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি রাজ্য সভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে জানান একথা জানান। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রুখতে সরকার অভ্যন্তরীণ যোগান বৃদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে নানা পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। এই সমস্ত পদক্ষেপ পরস্পর সংযুক্ত। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে মজুতভাণ্ডার থেকে পণ্যসামগ্রী বাজারে ছাড়া-সহ বেআইনি মজুতের ওপর নজর চালানো, আমদানি শুল্ক যুক্তিযুক্ত করা, আমদানি কোটার পরিবর্তন এবং পণ্য রপ্তানিতে নিয়ন্ত্রণের মতো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে সরকার। সেই লক্ষ্যেই খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে ও সার্বিক খাদ্য সুরক্ষা বজার রাখতে প্রথমেই রপ্তানি নীতিতে সংশোধন আনা হয়েছে। দুরুম প্রজাতির ভারতীয় গমের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এবং আন্তঃমন্ত্রক কমিটির

অনুমোদন ছাড়া আটা রপ্তানির উপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে ভাঙ্গা চালের রপ্তানি। একই সঙ্গে বাসমতী ছাড়া অন্যান্য চালের রপ্তানিতে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ যোগান বাড়াতে ডালশস্য এবং ভোজ্যতেলের নিয়ন্ত্রণেও পদক্ষেপ করছে কেন্দ্র। তুর ও মুসুর ডালের ক্ষেত্রে বেআইনি মজুত রুখতে এবং নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকার সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলিকে অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের অধীন মজুতকারীদের মজুতের খতিয়ান দিতে বলেছে। পাশাপাশি মজুতের পরিমাণের ওপর নজরদারিও চালানো হচ্ছে কেন্দ্রের তরফে। ভোজ্য তেলের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার অশোধিত পাম, সয়াবিন এবং সূর্যমুখী তেলের ওপর আমদানি শুল্ক শূন্যতে নামিয়ে এনেছে এবং কৃষি সেস হ্রাস করে ৫ শতাংশ করা হয়েছে।

চার দশকে প্রথমবার নিরাপত্তাকর্মীদের মৃত্যুসংখ্যা কমেছে ভারতে

পিআইবি ॥ গত চার দশকের মধ্যে এই প্রথমবার ২০২২ সালে অসামরিক ব্যক্তি ও নিরাপত্তাকর্মীদের মৃত্যুর সংখ্যা ১০০-র নীচে নেমেছে। তার জন্য ভারতের নিরাপত্তা বিভাগ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে। দেশের জনগণকে সুরক্ষিত রাখতে তাঁদের এই ভূমিকা প্রশংসনীয়। গত ৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা সম্পর্কে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে একথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, সন্ত্রাস কবলিত কয়েকটি রাজ্যের সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার মাধ্যমে দেশে সন্ত্রাস মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শকে প্রাধান্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার।

গত আট বছর ধরে সন্ত্রাস মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কয়েকটি বিশেষ স্তম্ভকে চিহ্নিত করেছে। এগুলি হলো হিংসা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নততর সমন্বয় এবং সন্ত্রাসকে কোনওভাবে প্রশ্রয় বা মদত না দেওয়ার উদ্দেশে জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টা। এই তিনটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিশেষ তৎপরতায় গত আট বছরে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ দমন করার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক

সাফল্যের নজির সৃষ্টি হয়েছে। ২০১০-এর তুলনায় ২০২২ সালে হিংসাত্মক ঘটনা হ্রাস পেয়েছে ৭৬ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১০ সালের তুলনায় অসামরিক ব্যক্তি ও নিরাপত্তা কর্মীদের মৃত্যুর হার ২০২২ সালে হ্রাস পেয়েছে ৯০ শতাংশ। শুধু তাই নয়, উগ্রপন্থী অধ্যুষিত জেলাগুলির সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে ৯০ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৪৫টিতে। পাশাপাশি নতুন নতুন পদ্ধতি ও উদ্ভাবন প্রচেষ্টার মাধ্যমে নকশাল দমনে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

ধর্মীয় স্থানগুলির প্রকৃত নাম প্রকাশ্যে আনতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের যে সব ধর্মীয় স্থানের নাম বিদেশি হানাদারদের নামে রাখা হয়েছে, সেই সব জায়গার প্রকৃত নাম খুঁজে বের করার দাবি জানিয়ে এবার জনস্বার্থ মামলা দায়ের হলো সুপ্রিম কোর্টে। দেশের ধর্মীয় স্থানগুলির আসল নাম প্রকাশ্যে আনার দাবি জানিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায়। তার জন্য একটি কমিটি গঠনের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। আবেদনে পুরনো ধর্মীয় স্থানগুলির প্রকৃত নাম খুঁজে বের করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিদেশি হানাদারদের নামে নামকরণ করা ভারতের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ধর্মীয় স্থানগুলির আসল নামগুলি উল্লেখ করে তাদের ওয়েবসাইট ও রেকর্ড আপডেট করতে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াকে নির্দেশ দিতেও আর্জি জানানো হয়েছে। সুপ্রিমকোর্টে পেশ করা আবেদনে বলা হয়েছে, দেশের প্রাচীন ধর্মীয় স্থানগুলি বিদেশি হানাদারদের নামে পরিচিতি পাওয়ায় ভারতীয়দের অনেক বড়ো ক্ষতি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সেই সব ভুল তথ্য ও নথি পড়ানো হচ্ছে দেশের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে। পড়ুয়ারা তাই নিয়ে গবেষণা করছে, আবার শিক্ষক হয়ে তারাই পরের প্রজন্মকে ভুল শেখাচ্ছে। ভারতের পুরো ইতিহাসটাই এভাবে বিকৃত হয়ে ধরা পড়ছে বিশ্বের কাছে। অশ্বিনী কুমার বলেন, 'স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যগুলোর নাম বহিরাগত শত্রুদের নামে থাকাটা দেশের সার্বভৌমত্ব, মর্যাদার অধিকারের পরিপন্থী। ভারতীয় সংবিধানের ২১, ২৫ ও ২৯ ধারায় দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে এবং মর্যাদার অধিকার, ধর্মের অধিকার এবং সংস্কৃতির অধিকার সুরক্ষিত করতেই এই পদক্ষেপ।'

মুনাফার পথে চার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

বিশেষ সংবাদদাতা॥ দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি সুদিন ফিরছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ডিসেম্বরে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে সামগ্রিক ভাবে ১২ টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মুনাফার অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ২৯,১৭৫ কোটি টাকা। শতাংশের হিসেবে সবচেয়ে বেশি মুনাফা হয়েছে ব্যাংক অব মহারাষ্ট্রের। তাদের লভ্যাংশ ১৩৯ শতাংশ। পৌঁছেছে ৭৭৫ কোটি টাকায়। দ্বিতীয় স্থানে কলকাতা ভিত্তিক ইউকো ব্যাংক। তাদের মুনাফা ৬৫৩ কোটি টাকা। গত অর্থবর্ষের এই সময়ের চেয়ে ১১০ শতাংশ এগিয়ে। একই সঙ্গে ইউনিয়ন ব্যাংক ও ইন্ডিয়ান ব্যাংকের লাভ ছাড়িয়েছে ১০০ শতাংশ।

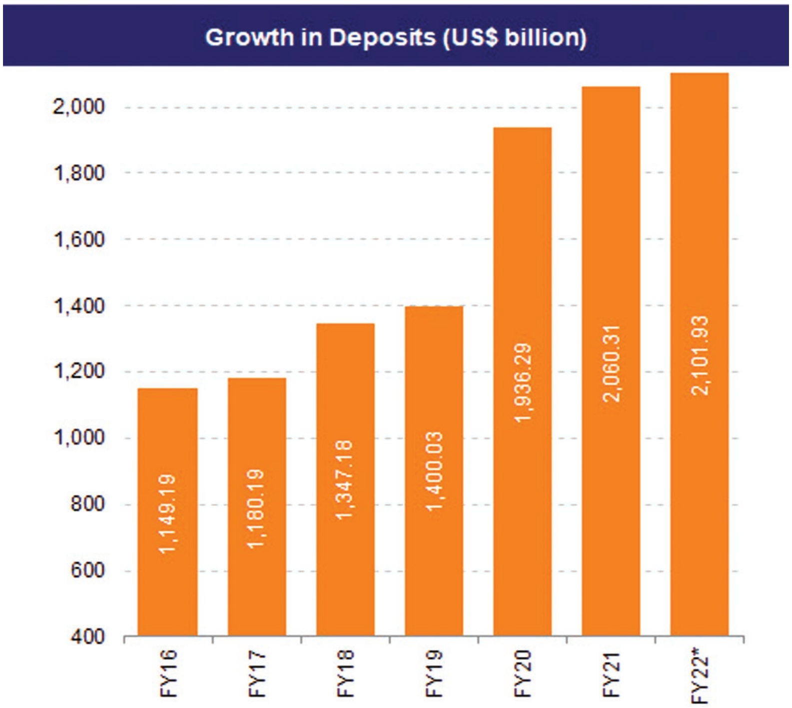

আর্থিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পিছনে রয়েছে কেন্দ্র সরকারের সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। অনুৎপাদক সম্পদের(এনপিএ) বোঝায় জেরবার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে পুঁজি জোগানোর কথা ঘোষণা করেছিল সরকার। অতিমারি আবহেও সরকার ব্যাংকগুলিকে আর্থিক সহযোগিতা করে। তবে একই সঙ্গে তাদের ঋণ বণ্টন এবং বাজার থেকে তহবিল জোগাড়ে জোর দিতে বলে কেন্দ্র। করোনা কাটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিতে গতি আসার পরই গত কয়েকটি ত্রৈমাসিকে লাভের মুখ দেখতে শুরু করে বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। তবে এবার সবমিলিয়ে ১২টি ব্যাংকের ক্ষেত্রে মোট মুনাফা বেড়েছে ৬৫ শতাংশ। অর্থবর্ষের প্রথম ৯ মাস ধরলে এই বৃদ্ধি ৪৩ শতাংশ। তার অঙ্ক ৭০,১৬৬ কোটি টাকা। কাজেই ভারতের ব্যাংকিং শিল্প এখন স্বস্তিতে। তিনটি ত্রৈমাসিকেই ধাপে ধাপে বেড়েছে লাভের অঙ্ক। পাশাপাশি, ঋণের সাপেক্ষে অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণও কমেছে ব্যাংকগুলির। ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে ব্যাংক অব মহারাষ্ট্র এবং স্টেট ব্যাংকের মোট এনপিএ নেমেছে যথাক্রমে ২.৯৪ শতাংশ ও ৩.১৪ শতাংশ। নিট হিসাবে যথাক্রমে ০.৪৭ এবং ০.৭৭ শতাংশ।

ত্রিবেণীর কুম্ভে হাজার হাজার পুণ্যার্থীর সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি হুগলীর ত্রিবেণীতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে কুম্ভস্নান সম্পন্ন হয়। নাগা সন্ন্যাসী, মঠমন্দিরের সাধুসন্ত-সহ হাজার হাজার পুণ্যার্থী এদিন ত্রিবেণীর সঙ্গমস্থলে ডুব দেন। প্রসঙ্গত, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর এই সঙ্গমস্থলকে বলা হয় মুক্ত বেণী। প্রয়াগ হলো যুক্ত বেণী। পুরাণ মতে প্রয়াগের সেই যুক্ত বেণীই হুগলীর ত্রিবেণীতে এসে মুক্ত হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এখানে পুণ্যস্নান হয়ে আসছে। মহাভারতের বনবাস পর্বেও উল্লেখ রয়েছে ত্রিবেণীর। বনবাসকালে পাণ্ডবরা মহর্ষি দ্বৈপায়নকে বিভিন্ন তীর্থস্থান এবং পুণ্যতীর্থ স্নান সম্পর্কে জানতে চাইলে মহর্ষি দ্বৈপায়ন ত্রিবেণীর কথাও বলেছিলেন।

ত্রিবেণীতে একসময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধুসন্তরা এসে মিলিত হতেন। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের পর সাধুসন্ত ও পুণ্যার্থীরা প্রায় একমাস ধরে পায়ে হেঁটে ত্রিবেণীতে এসে পৌঁছতেন। তারপর মাঘী সংক্রান্তির দিন কুম্ভস্নান সেরে তাঁরা ফিরে যেতেন। আজ থেকে ৭০৩ বছর আগে ১২০৪ সালে তদানীন্তন পশ্চিম দিনাজপুরে দেবীকোটের মুসলমান শাসক বখতিয়ার খিলজি ত্রিবেণীর পুণ্যস্নান বন্ধ করে দেয়। তারপর গত দু'বছর ধরে এই পুণ্যস্নান আবার চালু হয়েছে। যার উদ্যোগে রয়েছেন আমেরিকায় বসবাসকারী কাঞ্চন ব্যানার্জি। তিনি তাঁর গবেষণায় প্রমাণ করেন ত্রিবেণীতে ৭০৩ বছর আগে নিয়মিত পুণ্যস্নান হতো। সনাতন ভারতের অন্যতম এই পুণ্য অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয় মুঘল শাসকেরা। ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত এই পুণ্যস্নান চালু করার আবেদন করেন কাঞ্চন ব্যানার্জি। ২০২২-এ তৈরি হয় ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালনা সমিতি। পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে বাবু গুহ রায় জানান, বীরভূমের ১৩টি শক্তিপীঠ, বাংলাদেশের ৯টি ও উত্তরবঙ্গের ৩টি শক্তিপীঠ থেকে আনা জল এবার ত্রিবেণীতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ত্রিবেণীর পুণ্য জলে এদিন কুম্ভস্নান করেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

রেলের মেনুতে সুগার-ফ্রি ও মিলেট

বিশেষ প্রতিনিধি॥ রাগি কচুরির সঙ্গে টমেটো সস, সঙ্গে ইডলি, নারকেলের চাটনি, আচার এবং দই ও থেপলা। যাত্রাপথে রেলযাত্রীর খাবারের মেনুতে বড়সড় চমকের পথে হাঁটতে চলেছে ভারতীয় রেল। রেলমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, ট্রেনের অন-বোর্ড খাবারের তালিকায় এবার পাওয়া যাবে বিশেষ ডায়াবেটিক এবং মিলেট মেনু। তালিকায় রয়েছে রাগি মশালা ধোসা থেকে উপমা, পরোটা বয়েলড ভেজিটেবল্‌স-এর মতো খাবার। রাজধানী, শতাব্দী, দুরন্ত এক্সপ্রেসের মতো প্রিমিয়াম ট্রেন ছাড়াও দূরপাল্লার মেল, এক্সপ্রেস ট্রেনে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। আইআরসিটিসি'র পক্ষে জানানো হয়েছে, চলতি মাসের শেষেই দেশের সামগ্রিক রেল নেটওয়ার্কে এই বিশেষ মেনুর পরিষেবা পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে যাবে। বিশেষ করে ডায়াবেটিক রোগীদের কথা ভেবেই এই বিশেষ উদ্যোগ ভারতীয় রেলের। আইআরসিটিসি'র প্রকাশ করা নতুন খাবারের মেনুতে দেখা যাচ্ছে মিলেট মেনুতে যোগ করা হয়েছে আটটি নতুন পদ। রাগি লাড্ডু, রাগি কচুরি, রাগি ইডলি, রাগি মশালা ধোসা, রাগি উত্তপম, রাগি থেপলা, রাগি পরোটা এবং রাগি উপমা। দাম জিএসটি-সহ ৩০ থেকে ৫০ টাকা। অন্যদিকে ডায়াবেটিক মেনুতে থাকছে চারটি পদ। বয়েলড ভেজিটেবল্‌স, ওটস ব্র্যান্ডেড উইথ মিল্ক, ডিমের সাদা অংশ দিয়ে তৈরি ওমলেট এবং দুধ ও কর্নফ্লেক্স।

রেল মন্ত্রকের এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা সমস্ত জোনকে পাঠিয়েছে আইআরসিটিসি। সংস্থার পূর্বাঞ্চল শাখার অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় জানান, ‘‘নির্দেশিকা মতো আমরা যাবতীয় প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছি। খুব শীঘ্রই নতুন মেনুর স্বাদ পাবেন রেলযাত্রীরা।’’ খাবারের গুণাগুণের দিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে রেল। তাই ক্যাসারোলে মুড়ে, পেপার ন্যাপকিন ও কাঠের চামচের সঙ্গে খাবার তুলে দেবে রেল। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই সমস্ত মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে নতুন মেনু কার্যকর করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইআরসি টিসি'র জনসংযোগ আধিকারিক সিদ্ধার্থ সিংহ।

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৩২।।

জাহাজ আটদিন পরে নিউইয়র্ক পৌঁছালে ইমিগ্রেশন কমিশনার যখন যাত্রীদের আমেরিকায় থাকার ছাড়পত্র দিচ্ছিলেন তখন নির্দিষ্ট জামিনের ১০০ ডলার না থাকায় জাহাজের হেড স্টুয়ার্ড মহানামব্রতজীকে বললেন, অন্তত মিথ্যা করে বলুন। মহানামব্রতজী মিথ্যা বলতে রাজি হলেন না। তখন স্টুয়ার্ড নিজেই কমিশনারকে জানালেন, ওনার টাকা জাহাজ কোম্পানিতে জমা আছে।

হাতে মাত্র ১৭ ডলার। জাহাজের প্রধান স্টুয়ার্ড তাঁকে ট্যাক্সির টিকিট কেটে বসিয়ে দিলেন— নির্দেশ দিলেন শিকাগো বাসে তুলে দিতে। এই অযাচিত সহায়তায় মহানামব্রতজী ঈশ্বরকে আবার ধন্যবাদ জানালেন।

(ক্রমশ)